লেক্‌চার লুধিয়ানা

যুগ-ইমাম ও মুজাদ্দেদ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম

- এর

৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫ ইং তারিখে

লুধিয়ানায় এক বিরাট জনসমাবেশে পঠিত ভাষণ

লেক্‌চার লুধিয়ানা

লেখকের নাম ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)

বঙ্গানুবাদ ঃ মাওলানা বশীরুর রহমান

প্রকাশক ঃ নাজারত নশর ও এশায়াত
সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ২০২০ (ভারত)

সংখ্যা ঃ ১০০০

মুদ্রণে ঃ ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,
কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title : Lecture Ludhiana

Author : Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
The Promised Messiah & Mahdi[as]

Translator : Maulana Bashirur Rahman
1st Edition : November, 2020 Bengali (India)
Copies : 1000
Published by : Nazarat Nashr-o-Ishaat
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian, Gurdaspur,Punjab
Printed by : Fazle Umar Printing Press,
Qadian, Gurdaspur, Punjab

প্রকাশকের কথা

“লেকচার লুধিয়ানা” শিরোনামে পুস্তকটি মূলত সৈয়্যদনা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর একটি বক্তৃতা। বক্তৃতাটি তিনি ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানা শহরে হাজার হাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে উর্দূ ভাষায় প্রদান করেছিলেন। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ “লেকচার লুধিয়ানা” শিরোনামে প্রকাশ পাচ্ছে। পুস্তকটির অনুবাদ মূল উর্দূ থেকে করেছেন মৌলনা বশীরুর রহমান সাহেব। যা সর্বপ্রথম ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে নতুন আঙ্গিকে পুস্তকটির কম্পোজ করেছেন বুশরা হামিদ সহেবা। এছাড়া মূল উর্দূ পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুস্তকটির পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান,মোকাররম আবুতাহের মণ্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি এবং মোকাররম শেখ মহম্মদ আলী সাহেব সদর এশায়া’ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হল।

পুস্তকটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্‌তা’লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সর্বাঙ্গিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমীন।

নভেম্বর ২০২০
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া’ত কাদিয়ান

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তা’লার নির্দেশক্রমে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের সেবায় তার অসাধারণ লেখনীর দরুন পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাঁকে ‘সুলতানুল কলম’ (কলম সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর ৯০ হাজার চিঠি ও ১০ খন্ডের মলফুযাত ছাড়াও তিনি প্রায় ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থে তিনি একদিকে যেমন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সকল মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করেন এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য জগদ্বাসীর নিকট তুলে ধরেন, তেমনি অন্য দিকে তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চৌদ্দশত বৎসরে মুসলমানেরা বহু দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যে অগণিত ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছে তিনি আল্লাহ্‌তা’লার পক্ষ থেকে ‘হাকামান’ ও ‘আদলান’ (ন্যায় বিচারক ও ঝগড়ার নিষ্পত্তিকারী) রূপে সে সকল ভুল-ভ্রান্তি দূর করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তার অধিকাংশ পুস্তকে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করেছেন। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ছিলেন খোদার পুত্র। তারা আরো বিশ্বাস করে খোদার পুত্র খোদার ন্যায়ই অমর। কাজেই তিনি আজো আকাশে জীবিত আছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ যুগের মুসলমান আলেমগণ ও বিশ্বাস করেন হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্রিত্ববাদের মিথ্যা ধারণাকে আরো জোরদার করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) দ্ব্যর্থ কণ্ঠে বলেন, ঈসাকে মরতে দাও, ঈসার মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন রয়েছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন, আখেরী যামানায় ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌তা’লা তাকেই মসীহ্ ইবনে মরিয়ম রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তার জীবদ্দশায় অনেক বক্তৃতাই প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি বক্তৃতা তিনি ১৯০৫ সালের ৪ঠা নভেম্বরে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লুধিয়ানা শহরে হাজার হাজার

শ্রোতার উপস্থিতিতে উর্দূ ভাষায় প্রদান করেন। তাঁর এ বক্তৃতাটি 'লেকচার লুধিয়ানা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। তিনি এ বক্তৃতায় ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ, ও ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন, তাছাড়া এ বক্তৃতায় তিনি আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের শুভ সংবাদ দেন।

উল্লেখ্য, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর প্রায় ৮৮ টি গ্রন্থ এবং অন্যান্য লেখাসমূহ উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় প্রণীত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থাদির অতি সামান্য অংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদের সুযোগ হয়েছে। তাই বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনেরা তাঁর বিপুল জ্ঞান ভান্ডারের সাথে পরিচিত হয়ে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামকে জানার ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছেন না। তারা যাতে এ সুযোগ লাভ করতে পারেন সেই জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) -এর গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদের কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। এ কর্মসূচীর আওতায় তাঁর 'লেক্‌চার লুধিয়ানা' নামক আলোচ্য পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন আহমদীয়া জামাতের মিশনারী মৌলনা বশীরুর রহমান সাহেব।

অনূদিত এ পুস্তকটি পাঠ করে যদি বাংলা ভাষী ভাই-বোনেরা উপকৃত হন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ করুন যেন তাই হয়, আমীন।

এ অনূদিত পুস্তকটি প্রকাশের কাজে যারা যেভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
বাংলাদেশ

তারিখ-ঢাকা
জুলাই ১৪, ২০০০ইং

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,
[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন

এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে,সে তাকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচিতি

লেক্‌চার লুধিয়ানা

এ লেক্‌চারটি হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫ ইং তারিখে লুধিয়ানাতে প্রদান করেছিলেন। এই লুধিয়ানা থেকেই সর্বপ্রথম হুযূর (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি (আ.) আলেম কর্তৃক তাঁকে ও তাঁর জামাতকে ধ্বংস করার এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে তাঁর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

হুযুর (আ.) বলেন,

“আমি এ শহরে চৌদ্দ বছর পর এসেছি। এ শহর থেকে আমি এমন অবস্থায় ফিরে গিয়েছিলাম যখন গুটিকতক মানুষ আমার সঙ্গে ছিল। তখন আমাকে মিথ্যাবাদী, কাফের এবং দাজ্জাল সাব্যস্ত করার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল।

এসব লোকদের ধারণা এরূপ ছিল যে, অচিরেই এ জামাত পরিত্যক্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এ সিলসিলার নাম-নিশানা থাকবে না। তদনুযায়ী বড় বড় পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালানো হয়। আমার এবং আমার জামাতের বিরুদ্ধে একটি জঘন্য ষড়যন্ত্র এই করা হয় যে, কুফরী ফতোয়া লিখে সেই ফতোয়াকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়ানো হয়.......অথচ আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন, সেই কাফের সাব্যস্তকারীরা আর বেঁচে নেই; অথচ খোদাতা'লা আমাকে জীবিত রেখেছেন এবং আমার জামাতকে বৃদ্ধি করেছেন।”

অতঃপর হুযুর (আ.) চ্যালেঞ্জ করে বলেন,

“আমি দাবীর সঙ্গে বলছি, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এমন কোন মিথ্যা রটনাকারীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে, ২৫ (পঁচিশ) বছর পূর্বে অখ্যাত অবস্থায় এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারে তবে অবশ্যই স্মরণ রাখবে, এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং বিধান মিথ্যা হয়ে যাবে।”

এ লেক্‌চারে উপস্থিত অধিকাংশ শ্রোতা মুসলমান ছিলেন তাই হুযুর (আ.)

নিজের এবং নিজের জামাত সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে স্বীকারোক্তি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি (আ.) কুরআন, সুন্নত, ইজমা এবং কিয়াসের আলোকে বিশদভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুকে প্রমাণ করেছেন।

সবশেষে হুযুর (আ.) মুসলমানদেরকে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

"এখন পুনরায় ইসলামের শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এ উদ্দেশ্যকে নিয়েই আমি আগমন করেছি...... আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বলছি, আল্লাহ্‌তা'লা অন্য ধর্মগুলোকে মিটিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত এবং শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।"

(রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ডে প্রদত্ত পুস্তক পরিচিতি)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

লেক্‌চার লুধিয়ানা

যা হুযুর (আ.) ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫ ইং তারিখে
এক বিরাট জনসমাবেশে প্রদান করেছিলেন

প্রথমে আমি আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে এ শহরে পুনরায় তবলীগের সুযোগ দিয়েছেন। আমি এ শহরে চৌদ্দ বছর পর এসেছি। আমি এমন সময় এ শহর থেকে ফিরে গিয়েছিলাম যে, গুটিকতক লোক আমার সঙ্গে ছিল। তখন মিথ্যাবাদী, কাফের এবং দাজ্জাল সাব্যস্ত করার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমি মানুষের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় ছিলাম। ঐ সব লোকদের ধারণা এরূপ ছিল যে, অচিরেই এ জামাত পরিত্যক্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এ সিলসিলার নাম-নিশানা থাকবে না। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে বড় বড় পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালানো হয়। আমার এবং আমার জামাতের বিরুদ্ধে একটি জঘন্য ষড়যন্ত্র এই করা হয় যে, কুফরী ফতোয়া লিখে সেই ফতোয়াকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়ানো হয়। আমি অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ শহরের কতিপয় মৌলভী আমার উপর সর্ব প্রথম কুফরী ফতোয়া দিয়েছিল। অথচ আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন যে, আমাকে কাফের সাব্যস্তকারী ব্যক্তিগণ আর বেঁচে নেই; তথাপি খোদাতা'লা এখনও আমাকে জীবিত রেখেছেন এবং আমার জামাতকে বৃদ্ধি করেছেন। আমার বিরুদ্ধে পুনরায় যে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা-ও ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে রটানো হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এতে প্রায় দু'শত মৌলভী ও মাশায়েখের (ধর্মীয় নেতা) সাক্ষ্য এবং মোহর নেয়া হয়েছিল। তাতে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এ ব্যক্তি বেঈমান, অস্বীকারকারী, মিথ্যা রটনাকারী, কাফের বরং আকফার (সবচেয়ে বড় কাফের)। বস্তুতঃ যার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে আমার বিরুদ্ধে সে তাই বলেছে। ঐ সকল লোক স্বীয় ধারণায় মনে করে নিয়েছিল যে, এ অস্ত্রটিই জামাতটিকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে এ জামাত যদি মানুষের পরিকল্পিত ও মনগড়া হত তবে এটিকে ধ্বংস করার জন্য এ ফতোয়ার অস্ত্রই অত্যন্ত জোরালো ছিল; কিন্তু এ জামাতকে আল্লাহ্তা'লা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং সেটা কীভাবে বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং শত্রুতায় নিঃশেষ হতে পারে। বিরোধিতা যতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল এ জামাতের সমান ও শ্রেষ্ঠত্ব ততই সবার হৃদয়ের গভীরে গ্রথিত হচ্ছিল। আজ আমি আল্লাহ্তা'লার কৃতজ্ঞতা এজন্য জ্ঞাপন করছি যে, এক সময় ছিল যখন আমি এ শহরে এসে ফিরত গিয়েছিলাম তখন গুটি কতক মানুষ আমার সঙ্গে ছিল এবং আমার জামাতের সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। আর আজ এমন সময় এসেছে যে, এক বিরাট জামাত আমার সঙ্গে রয়েছে, যা আপনারাও প্রত্যক্ষ করছেন। জামাতের সদস্য সংখ্যা তিন লক্ষে পৌঁছে গেছে। এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিশ্চিত, তা কোটি কোটি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সুতরাং এ মহা বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ কর, এটা কি মানুষের কাজ হতে পারে? পৃথিবীর মানুষতো এ জামাতের নাম-গন্ধ মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তাদের সাধ্যে যদি কুলোত তাহলে কবেই তারা এটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। কিন্তু এটা আল্লাহ্তা'লার কাজ। তিনি যে বিষয়গুলোর ইচ্ছা পোষণ করেন পৃথিবী সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারে না। পৃথিবীর মানুষ যে সমস্ত পরিকল্পনা করে খোদাতা'লা যদি তা না চান তবে সেগুলো কখনো সংঘটিত হতে পারে না। আমার ব্যাপারে চিন্তা কর, সকল আলেম, পীরজাদা ও গদ্দীনশীনরা আমার বিরোধী হয়ে গেলো এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও আমার বিরোধিতায় সঙ্গে নিলো। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হলো, মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেয়া হলো। অতঃপর যখন এই পরিকল্পনায়ও সফল হলো না তখন আমার বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা শুরু করে দিল। আমাকে হত্যা মামলায় জড়িয়ে দিল এবং সর্বপ্রকার চেষ্টা চালালো যেন আমি শাস্তি পাই। এক পাদ্রী হত্যার অভিযোগ আমার উপর আরোপ করা হয়। এ মামলায় মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইনও আমার বিরুদ্ধে জোরালো চেষ্টা চালায় এবং স্বয়ং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আসে। সে চেয়েছিল আমি যেন ফেঁসে যাই এবং শাস্তি পাই। মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইনের এ চেষ্টা প্রকাশ করছিল সে দলিল-প্রমাণে অসমর্থ। এটা নিয়মের

কথা শত্রু যখন দলিল-প্রমাণে অসমর্থ হয়, যুক্তি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না তখন সে কষ্ট দেয়া ও হত্যা করার পরিকল্পনা করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আঁ-হযরত (স.)-এর বিরুদ্ধে কাফেররা যখন সর্বপ্রকার চেষ্টায় নিরাশ ও নিরুত্তর হয়েছিল অবশেষে তারাও তখন এ ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। তারা তাঁকে (স.) হত্যা, বন্দী, দেশ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করে। তারা আঁ-হযরত (স.)-এর সাহাবীদেরকেও বহু কষ্ট দিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছিল। এখন আমার সঙ্গেও সেই নিয়ম এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এ পৃথিবীর ‘খালেক’ (সৃষ্টি-কর্তা) ‘রব্বুল আলামীন’ (সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক) ব্যতীত অন্য কোন (শক্তিধর) সত্তা নেই। তিনিই সেই সত্তা যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেন আর পরিণামে সত্যকে সাহায্য দিয়ে বিজয়ী করে দেখান। বর্তমানে আল্লাহ্‌তা’লা পুনরায় তাঁর কুদরতের দৃষ্টান্ত প্রকাশ করেছেন আর আমি তাঁর সাহায্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সময় তোমরা সবাই দেখছো যে, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল অথচ আমি গৃহীতদের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা চিন্তা কর! আজ থেকে চৌদ্দ বছর পূর্বে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন কে পসন্দ করত, এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গী হোক ? আলেমগণ, দরবেশগণ এবং প্রত্যেক ধরনের গণ্যমান্য সম্মানিত ব্যক্তিরা চেয়েছিল আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই এবং আমার সিলসিলার অস্তিত্ব যেন বিলীন হয়ে যায়। তারা কখনো সহ্য করতে পারত না যে, আমি উন্নতি লাভ করি। তবে সেই খোদা যিনি সবসময় নিজের বান্দাদেরকে সাহায্য করেন এবং যিনি সত্যবাদীদের বিজয়ী করে দেখান, তিনিই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমার বিরুদ্ধবাদীদের আকাংখা ও পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীতে তিনি আমাকে সেই গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন যার ফলশ্রুতিতে এক জনগোষ্ঠীকে আমার দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছেন যারা ঐ বিরোধিতা এবং দুঃখ-কষ্টের আবরণ ও প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে আমার দিকে এসেছে এবং আসছে। এখন চিন্তার বিষয় যে, এই সফলতা কি মানবীয় ধ্যান-ধারণা এবং পরিকল্পনা দ্বারা সম্ভব? যেখানে পৃথিবীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এক ব্যক্তির ধ্বংসের চিন্তায় নিয়োজিত, তার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে

লিপ্ত এবং তার জন্য ভয়ানক আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত সেখানে সমস্ত বিপদাবলী থেকে সে পরিষ্কার অনায়াসে বেরিয়ে আসবে! অসম্ভব। এটিই খোদাতা'লার কাজ যা তিনি সব সময় প্রদর্শন করেছেন।

অতঃপর এ বিষয়ে শক্তিশালী দলিল হ'ল, আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে যখন কেউই আমার নাম জানত না এবং কোন ব্যক্তি কাদিয়ানে আমার নিকট আসতো না অথবা চিঠি-পত্র বিনিময় করতো না, এমন অজ্ঞাত ও অসহায়ত্বের দিনে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يأتون من كلّ فجٍ عميق۔ يأتيک من كلّ فَجٍّ عميق۔ لا تصعّر لخلق اللّٰہ ولا تسئم من النّاس۔ ربّ لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين۔

'ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক ওয়া ইয়াতীকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আ'মীক লা তুসা'য়্যির লিখালকিল্লাহি ওয়ালা তাস্‌আম মিনান্নাস রাব্বি লা তাযার্‌নী ফারদাঁও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারেসীন'

(অর্থঃ দূর-দূরান্তের সকল অঞ্চল হতে মানুষ তোমার নিকট আসবে এবং তাদের গমনাগমনে রাস্তা গর্ত হবে আর তা দিয়ে মানুষ তোমার নিকট আসতে থাকবে। তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি গাল ফুলিয়ে রেখো না এবং লোকদের নিকট হতে বিতৃষ্ণ হইও না। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিও না বস্তুত তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। - অনুবাদক)।

এইগুলো সেই শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী যা ঐ দিনগুলোতে হয়েছিল, আর তা মুদ্রণ করে বিলি করা হয়েছিল। প্রত্যেক জাতি এবং ধর্মের ব্যক্তিরা সেগুলো পড়েছে। সে সময় এবং পরিস্থিতিতে আমি অজ্ঞাতের মাঝে পড়েছিলাম, কেউ আমাকে জানত না। খোদাতা'লা বলেন যে, তোমার নিকট দূর-দূরান্তের দেশসমূহ থেকে লোকেরা আসবে এবং ব্যাপক সংখ্যায় আসবে। তাদের আপ্যায়নের জন্য সর্বপ্রকার সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও আসবে। কেননা এক ব্যক্তি হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের সকল ধরনের

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে না এবং তার পক্ষে ব্যয়ভার বহন করাও সম্ভব নয়। এ জন্য (আল্লাহ্) নিজেই বলেছিলেন,

يأتيك من كل فج عميق

'ইয়াতীকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আ'মীক'

তাদের সামগ্রীও সাথেই আসবে। এ ছাড়াও মানুষ লোকের আধিক্যকে ভয় পায় এবং খারাপ ব্যবহার করে বসে। এজন্য তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অতঃপর (আল্লাহ্‌তা'লা) এ-ও বলেছিলেন যে, মানুষের আধিক্য দেখে ক্লান্ত হয়ে প'ড় না।'

এখন আপনারা চিন্তা করুন! এটা কি মানবীয় শক্তির কাজ হতে পারে যে, ২৫/৩০ বছর পূর্বে একটি ঘটনার সংবাদ দিবে? আর তা-ও এ বিষয়ে? অতঃপর সেইভাবে ঘটেও যাবে? মানুষের অস্তিত্ব এবং জীবনের এক মুহূর্ত ভরসা নেই। এবং বলতে পারেনা দ্বিতীয় নিঃশ্বাস পাবে কি না। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন সংবাদ দেয়া কীভাবে তার শক্তি এবং ধারণায় আসতে পারে? আমি সত্য বলছি যে, এটি সেই সময় ছিল যখন আমি সম্পূর্ণ একা ছিলাম। মানুষের সঙ্গে দেখা করতেও আমার অনীহা ছিল। যেহেতু এমন এক সময় আসার ছিল যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার দিকে আকৃষ্ট হবে, সেহেতু এই উপদেশের প্রয়োজন ছিল,

لا تصعّر لخلق الله ولا تسئم من النّاس

'লা তুসা'য়্যির লিখালকিল্লাহি ওয়ালা তাস্‌আম মিনান্নাস'

অতঃপর সেই দিনগুলোতে (আল্লাহ্‌তা'লা) এ-ও বলেছিলেন,

انت منّی بمنزلة توحیدی۔ فحان ان تعان و تعرف بین الناس

'আনতা মিন্নী বেমান্‌যিলাতি তৌহীদী ফাহানা আন তা'য়ানা ওয়া তু'রাফা বাইনান্নাস'

অর্থাৎ সেই সময় আসছে যখন তোমায় সাহায্য করা হবে এবং তুমি মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করবে। অনুরূপভাবে এ বিষয়-বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য ফারসী, আরবী এবং ইংরেজীতেও এমন অনেক ইলহাম রয়েছে।

এত ব্যাপক সময় পূর্বে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে তা পুস্তকে ছেপে প্রকাশ করা

খোদা-ভীরুদের জন্য চিন্তার বিষয়। 'বারাহীনে আহমদীয়া' এমন একটি পুস্তক যা শত্রু-মিত্র সবাই পাঠ করেছেন এবং সরকারের নিকটও এর কপি পাঠানো হয়েছিল। খৃষ্টান এবং হিন্দুরাও এটিকে পাঠ করেছে। এই শহরেও অনেকের নিকট এই পুস্তকটি পাওয়া যাবে। তারা দেখুক যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লেখা আছে কি না? অতঃপর ঐ সকল মৌলভীদের (যারা কেবল বিরোধিতার জন্য আমাকে দাজ্জাল এবং কায্‌যাব বলে এবং এই বলে থাকে যে, আমার কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি) লজ্জা করা উচিত এবং ভাবা উচিত যে, এটি যদি ভবিষ্যদ্বাণী না হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী আর কাকে বলে? এটি সেই পুস্তক যার রিভিউ (পর্যালোচনা) মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসেইন বাটালভী লিখেছিলো। যেহেতু সে আমার সহপাঠী ছিলো এ জন্য প্রায়শই সে কাদিয়ান আসতো। সে এবং তদ্রুপ কাদিয়ান, বাটালা, অমৃতসর এবং আশে পাশের ব্যক্তিগণও ভাল করে জানতো যে, সে সময় আমি সম্পূর্ণ একা ছিলাম, কেউ আমাকে চিনতো না। সে সময়ের অবস্থা থেকে জ্ঞানীদের নিকট এটি চিন্তা বহির্ভূত মনে হত যে, আমার মত অপরিচিত ব্যক্তির জন্য এমন সময় আসবে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার সাথী হয়ে যাবে। আমি সত্য বলছি যে, সেই সময় আমি কিছুই ছিলাম না, একা ও অসহায় ছিলাম । স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা সেই সময় আমাকে এই দোয়া শিক্ষা দেন,

رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین

'রাব্বি লা তাযার্‌নী ফারদাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়ারেসীন'

(অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে একা ছেড়োনা বস্তত তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। -অনুবাদক)

এ দোয়া এ জন্য শিখিয়েছিলেন যে, তিনি সে সকল লোককে ভালবাসেন যারা দোয়া করেন। কেননা দোয়া ইবাদত। তিনি (আল্লাহ্‌) বলেন ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (উদয়ূ'নী আস্তাজিব্‌ লাকুম) *(সুরা মু'মিন 40 ঃ 61)* দোয়া কর আমি কবুল করব, আঁ-হযরত (স.) বলেছেন যে, ইবাদতের মজ্জা এবং মূল হচ্ছে দোয়া। এতে দ্বিতীয় ইশারা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা দোয়ার মাধ্যমে এ শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তুমি একা তবে এক সময় আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। আমি উচ্চস্বরে বলছি যে, এই দিবস যেরূপ আলোকিত এই ভবিষ্যদ্বাণীও তদ্রুপ আলোকিত। এটি ধ্রুব সত্য যে, আমি একা ছিলাম। **তোমাদের মধ্যে কে আছে যে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমার সাথে জামাত**

ছিল। কিন্তু এখন দেখ আল্লাহ্‌তা'লা তার এক দীর্ঘ সময় পূর্বে দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে সেই সমস্ত ওয়াদা এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি ব্যাপক জামাত আমার সাথী করেছেন। এমতাবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীকে কে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারে? অতঃপর ঐ পুস্তকে এ ভবিষ্যদ্বাণীও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মানুষ ভীষণভাবে বিরোধিতা করবে এবং এ জামাতকে বাধা দেয়ার জন্য প্রত্যেক ধরনের চেষ্টা করবে কিন্তু আমি (আল্লাহ্‌) সকলকে অকৃতকার্য করব।'

অতঃপর "বারাহীনে আহমদীয়াতে" এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য না করব ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না। এ ঘটনাগুলো বর্ণনা করে আমি ঐ সকল লোককে সম্বোধন করছি না যাদের হৃদয়ে খোদাতা'লার ভয় নেই আর মনে করে যেন তারা মৃত্যুবরণ করবে না। তারা তো খোদাতা'লার পবিত্র বাক্য পরিবর্তন করে। বরং ঐ সকল লোককে সম্বোধন করছি যারা আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এ মৃত্যুদ্বার সন্নিকট হচ্ছে। এ জন্য খোদা-ভীরু ব্যক্তিরা এমন বেয়াদব হতে পারে না। ভেবে দেখুন! ২৫ বছর পূর্বে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা কি মানবীয় শক্তি ও কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, যখন কিনা কেউ তাকে জানত না? সেই সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও হয় যে, মানুষ বিরোধিতা করবে কিন্তু তারা বিফল হবে। বিরোধীদের বিফল হওয়া এবং নিজের সফলতার ভবিষ্যদ্বাণী করা একটি অলৌকিক বিষয়। এটি মানতে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর।

আমি দাবীর সঙ্গে বলছি, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এমন কোন মিথ্যারটনাকারীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে ২৫ বছর পূর্বে অখ্যাত অবস্থায় এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারে তবে অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে, এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং পরম্পরা মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবস্থাকে কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে? এমনিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিনা কারণে সত্যকে অস্বীকার করা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা অবৈধ সন্তানের কাজ। কোন বৈধ সন্তান এমন সাহস করতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাক তবে আমি আমার সত্যতার এ যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করি। ভাল করে স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করা হয়

ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আমি পুনরায় বলছি, এই ভবিষ্যদ্বাণী 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে রয়েছে যার রিভিউ মৌলভী আবু সাঈদ লিখেছে। এ শহরে মৌলভী মুহাম্মদ হাসান এবং মুনসী মুহাম্মদ ওমর ও অন্যান্যদের নিকট (এ পুস্তকটি) আছে। এটির কপি মক্কা, মদীনা, বোখারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। সরকারের নিকট এর কপি পাঠানো হয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং ব্রাহ্মণগণও এটিকে পড়েছে। এটি কোন অপরিচিত পুস্তক নয় বরং খ্যাতি প্রাপ্ত পুস্তক। শিক্ষিত ধর্মানুরাগী কোন ব্যক্তি এটি থেকে অজ্ঞাত নয়। সেই পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা রয়েছে যে, 'পৃথিবী তোমার সঙ্গী হয়ে যাবে, পৃথিবীতে তোমাকে খ্যাতি দান করব, তোমার বিরুদ্ধবাদীদের বিফল করব'। এখন বল, এ কাজ কোন মিথ্যারটনাকারীর হতে পারে? তোমরা যদি এ সিদ্ধান্ত দাও হাঁ মিথ্যারটনাকারীর কাজ হতে পারে, তা হলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। যদি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পার তবে আমি মেনে নিব যে, আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু এমন কেউ নেই যে, এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে। তোমরা যদি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পার, আর অবশ্যই তা পারবে না, তাহলে আমি তোমাদের এটিই বলছি যে, **খোদাতা'লাকে ভয় কর এবং মিথ্যারোপ থেকে বিরত হও।**

স্মরণ রেখ, খোদাতা'লার নিদর্শনসমূহকে কোন দলিল ব্যতীত অগ্রাহ্য করা জ্ঞানীর কাজ নয় এবং এর পরিণাম কখনো বরকত পূর্ণ হয় না। আমি তো কারো মিথ্যা সাব্যস্ত করা বা অস্বীকারের পরওয়া করি না এবং সে সমস্ত আক্রমণ থেকে ভয় পাই না যা আমার উপর করা হয়। কারণ খোদাতা'লা আমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, লোকেরা মিথ্যা সাব্যস্ত ও অস্বীকার করবে এবং ভয়ানক বিরোধিতাও করবে কিন্তু কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আমার পূর্বে সত্যবাদী এবং খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্টদেরকে কি অগ্রাহ্য করা হয় নি? হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন ও ফেরাউনীরা, হযরত মসীহ্ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফকীহ্‌রা এবং আঁ-হযরত (স.)-এর বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকরা কোন্ ধরনের আক্রমণ আছে যা চালায় নি? কিন্তু আক্রমণগুলোর পরিণাম কি হয়েছিল? ঐ বিরুদ্ধবাদীরা সেই নিদর্শনগুলোর মোকাবেলায় কখনও কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পেরেছে কি? কখনো না। দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে তো সব সময়ই বিফল ছিল, তথাপি মুখ চলত

আর এ জন্য তারা কায্‌যাব বলতে থাকতো। তদ্রুপ এখানেও যখন অসমর্থ্য হ'ল তখন আর কিছু করতে না পেরে "দাজ্জাল" ও "কায্‌যাব" বলল। তবে তারা কি মুখের ফুৎকারে খোদাতা'লার নূরকে নির্বাপিত করতে পারবে? কখনো নির্বাপিত করতে পারবে না।

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

'ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহী ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন' (সূরা সাফ্‌ফ 61ঃ 9)
(অর্থঃ নিশ্চই আল্লাহ্ তাঁর নিজ নূরকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করবেন, মুশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। -অনুবাদক)

যে সকল ব্যক্তি কু-ধারণার উপাদান নিজের ভিতর রাখে তারা অন্য মোজেযা এবং নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বলে, সম্ভবতঃ এগুলো হাতের চালাকী। তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাদের কোন আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য নবুওয়তের নিদর্শনসমূহের মধ্যে মহান নিদর্শন এবং মোজেযা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকেই আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি তত্তরাত এবং কুরআন উভয় থেকেই প্রমাণিত। ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সমকক্ষ কোন মো'জেযা নেই। এ জন্য খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্টগণকে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারাই শনাক্ত করা উচিত। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা এই নিদর্শন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

'লা ইউযুহিরু আ'লা গায়বিহী আহাদান ইল্লা মানিরতাযা মির্ রাসূলিন' (সূরা আল্‌জিন্ন 72 ঃ 27-28)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার অদৃশ্য কারো উপর প্রকাশিত হয় না তবে তাঁর মনোনীত রসূলদের উপর হয়ে থাকে।

অতঃপর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, কতক ভবিষ্যদ্বাণীতে গোপন রহস্যাবলী ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকার কারণে অদূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও মোটাবুদ্ধির ব্যক্তিবর্গ এগুলোকে বুঝতে পারে না। সাধারণত এমন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উপরই মিথ্যারোপ হয়ে থাকে। দ্রুত ও অস্থিরচিত্তরা বলে থাকে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُوۡا

'ওয়াযান্নু আন্নাহুম কাদ কুযিবূ (সূরা ইউসুফ 12 ঃ 111)

(অর্থঃ তারা মনে করল তাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে -অনুবাদক) এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে মানুষ সন্দেহ সৃষ্টি করায় প্রকৃতপক্ষে সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো খোদাতা'লার সুন্নত অনুযায়ী পূর্ণ হয়ে থাকে। মু'মিন এবং খোদা-ভীরু ব্যক্তিদের উচিত তারা যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো না-ও বুঝেন তাহলে তারা যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর দৃষ্টি দেয় যেগুলোতে সূক্ষ্মতা নেই। অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সাধারণ (বুঝতে সহজ)। তারপর দেখুক সেগুলো কত সংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে। এমনিতে মুখে অস্বীকার করা তাকওয়া বিরোধী। সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যা পূর্ণ হয়ে গেছে তা সততা এবং খোদাভীতির সঙ্গে দেখা উচিত। কিন্তু অস্থির চিত্তদের মুখ বন্ধ করবে কে?

এ ধরনের বিষয়ের সম্মুখীন শুধু আমিই হই নি, হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং আঁ-হযরত (স.)ও সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখন আমার সঙ্গে যদি এমন হয় তবে আশ্চর্যের কিছু নেই বরং এমনটি হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা এটিই আল্লাহ্‌র সুন্নত ছিল। আমি বলছি মুমিনের জন্য একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তাতেই তার হৃদয় আতঙ্কিত হয়। কিন্তু এখানে শুধু একটি নয়, শত শত নিদর্শন রয়েছে বরং আমি দাবীর সঙ্গে বলছি যে, এত ব্যাপক সংখ্যায় নিদর্শন রয়েছে যা গণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সাক্ষ্য হৃদয়কে জয় করার জন্য এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুকূলে করে নেয়ার জন্য অপ্রতুল নয়। কেউ যদি খোদাকে ভয় করে আর হৃদয়ে বিশ্বস্ততা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে তবে তাকে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, এটি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে।

অতঃপর এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, বিরোধীরা যতক্ষণ (উপস্থাপিত দলিলকে) খন্ডন না করে এবং দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করে ততক্ষণ খোদাতা'লার অকাট্য দলিলই বিজয়ী।

বিষয়টির সার সংক্ষেপ হচ্ছে, ঐ অনিষ্ট এবং তুফান যা আমার উপর পতিত হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি সেই খোদার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি

আমাকে পাঠিয়েছেন। যার (বিরোধিতার) শিকড় এবং শুরু এ শহর থেকে হয়ে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি সমস্ত তুফান এবং পরীক্ষায় আমাকে দোষমুক্ত, নিরাপদ এবং সফলতা দান করেছেন। আমাকে এমন অবস্থায় এই শহরে এনেছেন যে, তিন লক্ষাধিক পুরুষ এবং মহিলা আমার বয়'আতের অন্তর্ভুক্ত। কোন মাস এমন যায় না যাতে দুই চার হাজার অথবা অনেক সময় পাঁচ হাজার এই সিলসিলায় প্রবেশ না করে।

অতঃপর সেই খোদা এমন সময় আমাকে সাহায্য করেছেন যখন জাতিই শত্রু হয়ে গিয়েছিল। জাতি যখন কোন ব্যক্তির শত্রু হয়ে যায় তখন সে বড় অসহায় ও দুর্বল হয়ে যায়। কেননা জাতিই হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে থাকে, তারাই তাকে সাহায্য করে। অন্য ব্যক্তিরা এমনিতেই শত্রু হয়ে থাকে যে, আমাদের ধর্মের উপর আঘাত করছে। কিন্তু নিজের জাতি যখন শত্রু হয়ে যায় তখন রক্ষা পাওয়া এবং সফল হওয়া সাধারণ কথা নয় বরং এটি একটি শক্তিশালী নিদর্শন।

আমি অত্যন্ত পরিতাপ এবং ব্যথিত হৃদয়ে বলছি যে, জাতি আমার বিরোধিতায় কেবল তাড়াহুড়াই করে নি বরং অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাও দেখিয়েছে। কেবল 'ওফাতে মসীহ্'-এর একটি বিষয়ে বিরোধ ছিল, যার সম্পর্কে আমি কুরআন করীম, আঁ-হযরত (স.)- এর সুন্নত, সাহাবাদের ইজমা, সাধারণ জ্ঞানের দলিল এবং বিগত পুস্তকাদি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলাম এবং এখনও করছি। হানাফী সম্প্রদায় অনুযায়ী হাদীসের অকাট্য হুকুম, কিয়াস এবং শরীয়তের দলিলসমূহ আমার পক্ষে ছিল। তথাপি ঐ সকল ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এ বিষয়টি সঠিকভাবে জানা এবং দলিলসমূহ শুনার পূর্বেই বিরোধিতায় এত বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে, আমাকে কাফের আখ্যা দেয়। সেই সঙ্গে আরও যা ইচ্ছা বলে এবং আমাকে দায়ী করে। আমানতদারী, নেকী এবং তাকওয়ার চাহিদা এই ছিল যে,প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিত। আমি যদি আল্লাহ্ এবং রসূলের কথা অমান্য করতাম তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের অধিকার ছিল, আমাকে যা ইচ্ছা তা বলার, "দাজ্জাল" "কায্যাব" ইত্যাদি। কিন্তু আমি শুরু থেকে বর্ণনা করে আসছি যে, আমি কুরআন করীম এবং আঁ-হযরত (স.)- এর অনুবর্তিতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিকে বেঈমানী মনে করি। আমার ধর্ম বিশ্বাস এটিই,

যে এ গুলোকে বিন্দু পরিমাণ ছেড়ে দিবে সে জাহান্নামী। অতঃপর আমি এ বিশ্বাসকে কেবল বক্তৃতা নয় বরং নিজের লেখা প্রায় ষাটটি (৬০) রচনায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। রাত দিন আমার এই চিন্তা এবং খেয়াল থাকে। এই বিরোধীরা যদি আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করতো তাহলে তাদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না যে, অমুক বিষয় ইসলাম বহির্ভূত, এটির কারণ কি? অথবা তুমি এটির জবাব কি দিচ্ছ? তারা এরূপ না করে কাফের সাব্যস্ত করতে বিন্দু পরিমাণ ভ্রুক্ষেপ করল না। শুনল আর কাফের ঘোষণা করে দিল। আমি অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয়ে তাদের এই কর্মকে অবলোকন করছি। কেননা প্রথমতঃ মসীহ্‌র জীবিত বা মৃত্যুর বিষয়টি এমন কোন বিষয় নয় যা ইসলামে প্রবেশের জন্য শর্তস্বরূপ। এখানেও হিন্দু অথবা খৃষ্টান মুসলমান হয়ে থাকে কিন্তু বল, (মুসলমান হবার জন্য) নিম্নের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন স্বীকারোক্তি নিয়ে থাক কি?

اٰمنت باللہ و ملائکتہٖ و کتبہٖ و رسلہٖ والقدر خیرہٖ و شرّہٖ من اللہ تعالٰی والبعث بعد الموت

‘আমানতু বিল্লাহী ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল্‌ কাদ্‌রি খায়রিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল্‌ বা'সি বা'দাল মাউত’

(অর্থঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমূহের উপর, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভাল মন্দ তকদীরের উপরে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিবসে। -অনুবাদক) এ বিষয়টি যখন ইসলামের অংশ নয় তাহলে আমার উপর ওফাতে মসীহ্‌ - এর ঘোষণার কারণে কেন এত উগ্রতা প্রদর্শন করা হলো যে, এই ব্যক্তি “কাফের” এবং “দাজ্জাল” তাদেরকে যেন মুসলমানদের কবর স্থানে দাফন না করা হয়, তাদের মাল লুণ্ঠন করা বৈধ, তাদের মহিলাদের নিকাহ করা ছাড়া ঘরে রাখা বৈধ এবং তাদের হত্যা করা পুণ্যের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। একতো সেই সময় ছিল যখন এই মৌলভীরা চিৎকার করতো যে, কারো মধ্যে যদি ৯৯ (নিরানব্বই) টি কুফরীর কারণ থাকে আর একটি ইসলামের, তথাপিও কুফরীর ফতওয়া দেওয়া উচিত নয়। তাকে মুসলমানই বল। কিন্তু এখন কি হয়ে গেছে? আমি কি এর চেয়েও নীচে চলে গেছি? আমি এবং আমার জামাত কি

اشھد ان لا الٰہ الّا اللہ و اشھد ان محمّدًا عبدہٗ و رسولہٗ

“আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু’ (অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নাই

এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রসূল - অনুবাদক) পড়ি না? আমি কি নামায পড়ি না? আমার শিষ্যরা কি নামায পড়ে না? আমরা কি রমযানের রোযা রাখি না? আমরা কি সেই সমস্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নই যা আঁ-হযরত (স.) ইসলাম বলে আখ্যা দিয়েছেন?

আমি যথার্থতার সঙ্গে খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। তারা আঁ-হযরত (স.) এবং কুরআন করীমের উপর সেভাবে ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের রাখা উচিত। আমি এক বিন্দু পরিমাণও ইসলামের বাইরে পা রাখাকে ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার ধর্ম এটিই যে, কোন ব্যক্তি যত বেশী কল্যাণ, বরকত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেতে চায় তা কেবল আঁ-হযরত (স.) এর সত্যিকার অনুসরণ এবং পূর্ণাঙ্গীণ ভালবাসার মাধ্যমে পেতে পারে, নতুবা নয়। তিনি (স.) ছাড়া পুণ্যের কোন বক্তা নেই। তবে এটি সত্য যে, আমি কখনও বিশ্বাস করি না যে, মসীহ্ (আ.) আকাশে গিয়েছেন আর এখন পর্যন্ত জীবিত কায়েম আছেন। এই বিষয়টিকে মানলে আঁ-হযরত (স.)-এর বড়ই অপমান এবং অমর্যাদা হয়। এই দুর্নামকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারি না। সবাই জানেন আঁ-হযরত (স.) তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পবিত্র মদীনায় তার সমাধি রয়েছে। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হাজীও সেখানে গিয়ে থাকেন। মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে যদি মৃত্যু বিশ্বাস করা বা তার দিকে মৃত্যুকে সম্পর্ক যুক্ত করা অসম্মানি হয় তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, আঁ-হযরত (স.) সম্পর্কে তাদের এই অবমাননা এবং বেআদবী কেন বিশ্বাস করা হয়। তোমরা তো অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলে থাক যে, আঁ-হযরত (স.) মৃত্যুবরণ করেছেন। (অ-হযরত (স.) এর) জন্য অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করে থাক। কাফেরদের মোকাবেলায়ও তোমরা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার কর যে, তিনি (স.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তথাপি আমি বুঝি না হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুতে কোন পাথর আপতিত হয় যে, রক্তচক্ষু করে দাও। আমাদের কোন দুঃখ হতো না যদি আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুর শব্দ শুনে এমন অশ্রু প্রবাহিত হত। কিন্তু পরিতাপ তো এটিই যে, খাতামান্নাবীঈন (স.) এবং সারওয়ারে আলম (জগতের বাদশা) সম্পর্কে তোমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মৃত্যু স্বীকার কর। আর যে ব্যক্তি নিজেকে আঁ হযরত (স.)-এর জুতার ফিতা খোলার

উপযুক্তও মনে করে না তাঁকে জীবিত বিশ্বাস করে থাক। তাঁর সম্পর্কে মৃত্যুর শব্দ উচ্চারণ করতেই তোমাদের ক্রোধ এসে যায়। আঁ হযরত (স.) এখন পর্যন্ত জীবিত থাকলে কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ তিনি (স.) সেই মহান হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি (স.) সেই কর্মপদ্ধতি দেখিয়েছেন যার উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত আদম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, আঁ-হযরত (স.)- এর সত্তার যে পরিমাণ প্রয়োজন পৃথিবীবাসী এবং মুসলমানদের ছিল সে পরিমাণ প্রয়োজন মসীহ্‌র সত্তার ছিল না। তাঁর (সা.) সত্তা পরিপূর্ণ মোবারক সত্তা ছিল। তিনি (স.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সাহাবারা এমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন যে, হযরত ওমর (রা.) খাপ থেকে তরবারি বের করে নিয়ে বললেন, 'যে আঁ হযরত (স.)-কে মৃত বলবে আমি তার শিরচ্ছেদ করব।' এই আবেগের সময় আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে এক বিশেষ নূর ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি সকলকে একত্রিত করে খুতবা পাঠ করেন ঃ-

مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ

'মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন কাদ্ খালাত্ মিন কাবলিহির রসূল' (সূরা আল ইমরান 3 ঃ 145)

অর্থাৎ আঁ-হযরত (স.) একজন রসূল এবং তাঁর (স.) পূর্বে যত রসূল এসেছিলেন তারা সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন। এখন আপনারা ভাবুন এবং চিন্তা করে বলুন, হযরত আবু বকর (রা.) আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুতে এ আয়াত কেন পাঠ করেছিলেন। এতে তার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ই বা কি ছিল? যখন কিনা সকল সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আমি নিশ্চিত এবং আপনারাও অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুর কারণে সাহাবাদের হৃদয়ে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছিল। আর তাঁরা এ মৃত্যুকে অসময়ে এবং সময়ের পূর্বে মনে করেছিলেন। তারা পসন্দ করছিলেন না যে, আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনবেন। এমন সময় ও পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.)-এর মত উচ্চ মার্গের সাহাবীও এ আবেগের অবস্থায় তার আবেগ দমন করতে পারছিলেন না। কেবল এ আয়াতই তার সান্ত্বনার কারণ ছিল। তিনি যদি জানতেন অথবা তার বিশ্বাস হত যে, হযরত ঈসা (আ.)

জীবিত আছেন তাহলে তিনি জীবন্মৃতের ন্যায় হতেন। তিনি (রা.) আঁ-হযরত (স.)-এর সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন। তার (স.) জীবিত থাকা ছাড়া অন্যের জীবিত থাকা সহ্যই করতে পারতেন না। তথাপি কীভাবে নিজের চোখের সম্মুখে তাকে (স.) মৃত দেখতেন ও মসীহ্‌কে জীবিত বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) যখন খুতবা পাঠ করছিলেন তখন তার আবেগ স্থিমিত হয়ে যায়। সেই সময় সাহাবাগণ মদীনার অলিতে গলিতে এ আয়াত পড়ছিলেন। তারা এটি মনে করছিলেন, এ আয়াত যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সময় হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) একটা শোক গাথা (বিলাপ) লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন,

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِىْ فَعَمِىَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُحَاذِرُ

‘কুনতাস্‌ সাওয়াদা লিন্নাযিরী ফাআ’মিয়া আ’লাইয়ান নাযিরূ
মান্‌ শায়া বা’দাকা ফাল্‌ ইয়ামুত্‌ ফা’আলাইকা কুন্‌তু উহাযিরূ’

(অর্থঃ তুমি আমার চোখের মণি ছিলে তোমার মৃত্যুতে আমার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার মৃত্যুর পরে যে ইচ্ছা সে মৃত্যুবরণ করুক আমি তো তোমার মৃত্যুতে শঙ্কিত ছিলাম যা ঘটে গিয়েছে। -অনুবাদক)

যেহেতু উপরোক্ত আয়াত বলে দিয়েছিল যে, সবাই মারা গিয়েছেন এজন্য হাসসান (রা.)ও বলেছিলেন যে, এখন কারো মৃত্যুর কোন পরওয়া নাই। নিশ্চিত মনে রাখবে আঁ-হযরত (স.)-এর মোকাবেলায় অন্য কারও জীবন সাহাবাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল, আর তাঁরা সেটাকে সহ্য করতে পারতেন না। এভাবে আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুতে এটা প্রথম ইজমা ছিল যা পৃথিবীতে সংগঠিত হয়। এতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল ।

আমি বারংবার এ বিষয়ে জোর দিয়ে থাকি যে, এ দলিলটা বড় শক্তিশালী দলিল। এতে মসীহ্‌ (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যু কোন সাধারণ এবং ছোট বিষয় ছিল না যার শোক সাহাবাদের হয় নি। একটা গ্রামের সরদার অথবা মহল্লার অথবা ঘরের কোন ভাল ব্যক্তি

মরে গেলে সেই ঘরের, গ্রামের অথবা মহল্লার ব্যক্তিদের দুঃখ হয়ে থাকে। অথচ সেই নবী যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমাতুল্লীল আলামীন হয়ে এসেছিলেন, যেভাবে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

'ওয়ামাআর্‌সালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন' (সুরা আম্বিয়া 21 ঃ 108)

(অর্থঃ এবং আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। -অনুবাদক) অত:পর অন্য জায়গায় বলেছেন,

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

'কুল্‌ ইয়া আইয়্যু হান নাসু ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামী'আ' (সূরা আ'রাফ 7 ঃ 159)

(অর্থঃ তুমি বল, হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য রসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি -অনুবাদক) তারপর সেই নবী যিনি সততা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত রেখেছেন এবং সেই উৎকর্ষ দেখিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়। তাঁর মৃত্যু হবে অথচ তাঁর ঐ জীবন উৎসর্গকারী অনুসারীদের উপর প্রভাব পড়বে না, যারা তাঁর (স.) জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। যাঁরা দেশ ছেড়েছে, আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর (স.) জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টকে নিজেদের জন্য আত্মার সন্তুষ্টি মনে করেছে। সামান্য চিন্তা এবং দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, হুযুর (স.)-এর মৃত্যুর কারণে তাদের (রা.) যে পরিমাণ দুঃখ হতে পারে সেটার অনুমান এবং ধারণা আমরা করতে পারি না। তাঁদের সন্তুষ্টি এবং শান্তির কারণ এই আয়াতই ছিল যা হযরত আবু বকর (রা.) পড়েছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন যে, তিনি (রা.) এমন নাজুক অবস্থায় সাহাবাদের (রা.) সামলিয়ে ছিলেন।

আমাকে পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, কতক বোকা নিজেদের দ্রুত এবং অস্থিরচিত্তের কারণে বলে থাকে যে, এই আয়াত নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর পড়েছিলেন তথাপি হযরত ঈসা (আ.) এই আয়াতের বাইরে

থেকে যান। আমি বুঝতে পারছি না এমন নির্বোধদের কি বলব। তারা মৌলভী আখ্যা পাওয়া সত্ত্বেও এমন অর্থহীন বিষয় উপস্থাপন করে। তারা বলে না যে, এই আয়াতে সেই শব্দটা কী যা হযরত ঈসা (আ.)-কে পৃথক করে। আল্লাহ্‌তা'লা তো এই আয়াতে কোন বিষয়ই 'বহস' (তর্ক) এর জন্য রাখেন নি। 'কাদ খালাত' এর অর্থ নিজেই করে দিয়েছেন। اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ "আফা ইম্মাতা আও কুতিলা' *(সূরা আলে ইমরান 3 ঃ 145)* অর্থাৎ অতএব সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়। এ ছাড়া যদি তৃতীয় কোন অবস্থা থাকত তা হলে কেন বলে দিলেন না,

رفع بجسده العنصری الی السّماء

' আওরুফিয়া বিজাসাদিহিল উ'সুরীয়ে ইলাস্‌সামায়ী'

(অর্থঃ তাকে সশরীরে আকাশে উঠানো হয়েছে।-অনুবাদক) খোদাতা'লা কি এটিকে ভুলে গিয়েছিলেন যা তারা স্মরণ করাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ্‌ মিন যালেক।

যদি কেবল এই আয়াতটিই থাকত তথাপি যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমি বলছি আঁ-হযরত (স.)-এর জীবন তাদের নিকট এমন প্রিয় ও আপন ছিল যে, এখন পর্যন্ত তাঁর (স.) মৃত্যুর কথা মনে করে এই ব্যক্তিরাও (মৌলভীরাও) কাঁদে। তাহলে সাহাবাদের জন্য তো সেই সময় আরও ব্যথা এবং মর্মবেদনা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমার মতে মুমিন সে-ই হতে পারে যে তাঁর (স.) অনুসরণ করে আর সেই কোন মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। যে ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেউ'নী ইউহবিব্‌কুমুল্লাহ' (সূরা আলে ইমরান 3 ঃ 32)

অর্থাৎ, বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর তাতে যেন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নেন। ভালবাসার দাবী তো এই যে, প্রেমাস্পদের কর্মের সঙ্গে যেন বিশেষ ভালোবাসা থাকে। মৃত্যুবরণ করা রসূল করীম (স.)-এর সুন্নত। তিনি (স.) মৃত্যুবরণ করে দেখিয়েছেন। সুতরাং কে আছে যে জীবিত থাকবে

অথবা জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করবে অথবা অন্য কারও জন্য জীবিত থাকার প্রস্তাব করবে যে, সে জীবিত থাকুক। ভালোবাসার দাবী তো এটাই যে তাঁর (স.) অনুসরনে বিলীন হয়ে আত্মার আবেগসমূহকে দমন করবে আর চিন্তা করবে, আমি কার উম্মত। এমতবস্থায় যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন, সে কীভাবে হুযূর পাক (স.)-এর ভালবাসা এবং অনুসরণের দাবী করতে পারে। কারণ সে পছন্দ করে যে মসীহ্ (আ.)-কে তাঁর (সা.) অপেক্ষা উত্তম আখ্যা দেয়া হোক। সে পছন্দ করে যে তাঁকে (স.) মৃত বলা হোক অথচ তাঁকে (মসীহ্কে) জীবিত বিশ্বাস করা হোক।

আমি সত্যি সত্যিই বলছি, আঁ-হযরত (স.) যদি জীবিত থাকতেন তবে এক ব্যক্তিও কাফের থাকত না। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন কেবল ৪০ কোটি খৃষ্টান ব্যতীত আর কি প্রতিফল দেখিয়েছে। চিন্তা করে দেখ! তোমরা কি তার জীবিত থাকার বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখ নি? এটির ফল কি ভয়ানক হয়নি? মুসলমানদের এমন কোন সম্প্রদায়ের নাম নাও যাদের থেকে কেউ খৃষ্টান হয়নি। অথচ আমি নিশ্চিত বলতে পারি আর এটা সম্পূর্ণ সঠিক কথা যে, খৃষ্টানদের প্রত্যেক দল থেকে মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। মুসলমানদেরকে খৃষ্টান বানানোর একটা অস্ত্র খৃষ্টানদের হাতে রয়েছে আর এটিই হচ্ছে, ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার এই বিষয়। তারা বলে যে, এই বৈশিষ্ট্য অন্য কারও মধ্যে প্রমাণ কর। তিনি যদি খোদা না হয়ে থাকেন তবে কেন তাকে এই বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে? যিনি 'হাইয়ুন' (চিরঞ্জীবি) এবং 'কাইয়ুম' (চিরস্থায়ী) (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক অর্থাৎ আমরা এ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাই)? জীবিত থাকার এই বিষয়টা তাদেরকে সাহসী করেছে। তারা মুসলমানদের উপর সেই আক্রমণ করেছে যার প্রতিফল সম্বন্ধে আমি তোমাদের বলেছি। এর বিপরীতে তোমরা যদি পাদ্রীদের নিকট প্রমাণ করে দাও যে, মসীহ্ মারা গেছে তবে এর ফল কী হবে? আমি বড় বড় পাদ্রীদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে মসীহ্ মারা গেছে এটি যদি প্রমাণ হয়ে যায় তবে আমাদের ধর্ম জীবিত থাকতে পারে না।

আরো একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মসীহ্র জীবিত থাকার বিশ্বাসটা তোমরা তো পরীক্ষা করে দেখেছ। এখন মৃত থাকার বিশ্বাসটাও একটু

পরীক্ষা কর এবং দেখ যে, এ বিশ্বাসে খৃষ্টান ধর্মের উপর কী আঘাত আসে। যেখানেই আমার কোন শিষ্য এ বিষয়ে খৃষ্টানদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় তখনই তারা অস্বীকার করে। কারণ তারা জানে এ পথে তাদের পরাজয় সন্নিকটে। মৃত্যুর দ্বারা তাদের 'কাফফারা' (প্রায়শ্চিত্তবাদ) 'উলুহীয়্যত' (ঐশ্বরত্ব) আর 'ইবনীয়্যত' (পুত্রত্ব) প্রমাণিত হয় না। অতএব এ বিষয়টাকে কিছুদিন পরীক্ষা কর তাহলে সত্য নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

মনে রাখবে কুরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহে এ ওয়াদা ছিল যে, ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করবে, অন্যান্য ধর্মসমূহের উপর বিজয় লাভ করবে এবং ক্রুশ ধ্বংস হবে। এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, পৃথিবী উপকরণের স্থান। এক ব্যক্তি অসুস্থ হলে এতে কি সন্দেহ যে, 'শেফা' (আরোগ্য) আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন তবে এর জন্য ঔষধসমূহে বৈশিষ্ট্য ও তিনি (আল্লাহ্) রেখেছেন। যখন কোন ঔষধ দেয়া হয় তখন সেটি কাজ করে। তৃষ্ণা পেলে তা নিবারণকারী আল্লাহ্‌ই। তথাপি তা নিবারনের জন্য পানিও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। তেমনি ক্ষুধা পেলে তা নিবৃতকারী তিনিই তথাপি খাদ্যও তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। এমনি ভাবে ইসলামের বিজয় এবং ক্রুশ তো ধ্বংস হবেই যা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। তবে এর জন্য তিনি উপকরণ নির্ধারণ করেছেন এবং একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব কুরআন মজীদ এবং হাদীসসমূহের ভিত্তিতে স্বীকৃত যে, শেষ যুগে যখন খৃষ্টানদের প্রাধান্য হবে। সে সময় মসীহ্ মাওউদের হাতে ইসলামের বিজয় হবে। তিনি সমস্ত ধর্ম ও জাতির উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করে দেখাবেন, দাজ্জাল বধ করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং যুগটি হবে শেষ যুগ। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ ও অন্যান্য বুযুর্গগণ যাঁরা শেষ যুগ সম্পর্কে পুস্তক লিখেছেন তারাও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এখন সে অনুযায়ী এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্যও তো কোন উপকরণ এবং মাধ্যম হবে। কেননা আল্লাহ্‌তা'লার এটি পদ্ধতি যে, তিনি উপকরণের মাধ্যমে কাজ নেন। ঔষধে আরোগ্য দান এবং খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ করেন। তদ্রুপ যখন কিনা এখন খৃষ্টান ধর্মের প্রাধান্য হয়ে গিয়েছে আর মুসলমানদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী ইসলামকে বিজয়দান করার ইচ্ছা করেছেন। এ কারণে অবশ্যই কোন মাধ্যম ও উপকরণ প্রয়োজন আর তা হচ্ছে মসীহ্‌র এই মৃত্যুর অস্ত্র। এ অস্ত্রের

মাধ্যমে ক্রুশীয় ধর্মের উপর মৃত্যু আপতিত হবে এবং তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে। আমি সত্যি সত্যিই বলছি খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য মসীহ্‌কে মৃত সাব্যস্ত করার চেয়ে বড় আর কি উপকরণ হতে পারে? নিজের ঘরে একাকিত্বে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করুন। বিরোধিতার অবস্থায় তো উন্মাদনা এসেই থাকে তথাপি পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ চিন্তা করে থাকেন। আমি যখন দিল্লীতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখন পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ স্বীকার করেছিলেন এবং সেখানেই বলে উঠেন যে, নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) -এর উপাসনার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাঁর জীবিত থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত এ (বিশ্বাস) দূর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হবে না বরং খৃষ্টানরা এ থেকে প্রেরণা পাবে।

যারা তাঁর (ঈসা) জীবনকে ভালবাসে তাদের চিন্তা করা উচিত যে দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে ফাঁসি হয়ে থাকে অথচ এখানে এত ব্যাপক সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও তারা অস্বীকারই করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন,

يٰعِيْسٰى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ

'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউ'কা ইলাইয়্যা' (সূরা আলে ইমরান 3 ঃ 56)

(অর্থঃ হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে উন্নীত করব- অনুবাদক)

অতঃপর হযরত মসীহ্ (আ.)-এর নিজের স্বীকারোক্তিও এ কুরআন মজীদেই রয়েছে,

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

"ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী কুনতা আনতার্ রাকীবা আলাইহিম" (সূরা মায়েদা 5 ঃ 118)

(অর্থঃ কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে -অনুবাদক) "তাওয়াফ্‌ফার" অর্থ যে মৃত্যু তা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। কেননা এ শব্দটা আঁ-হযরত (স.) সম্পর্কেও এসেছে।

যেমন বলা হয়েছে ঃ-

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

‘ওয়া ইম্মা নুরিয়ান্নাকা বা’যাল্লাযী না’য়েদুহুম আও নাতা ওয়াফ্‌ফাইয়ান্নাকা” (সূরা ইউনুস 10 ঃ 47)

[অর্থঃ সুতরাং আমরা তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলো কতক আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করে) দেখিয়েছি অথবা (এর পূর্বেই) তোমাকে আমরা মৃত্যু দিব। -অনুবাদক) আঁ-হযরত (স.) ও ‘ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী বলেছেন যার অর্থ মৃত্যুই। তদ্রুপ হযরত ইউসুফ (আ.) এবং অন্যান্যদের সর্ম্পকেও এ শব্দই এসেছে। এমতাবস্থায় কীভাবে এর ভিন্ন কোন অর্থ হতে পারে। মসীহ্‌র (আ.) মৃত্যু সম্পর্কে এটা একটা বড় দলিল। এ ছাড়া আঁ-হযরত (স.) মে’রাজের রাত্রিতে ঈসা (আ.)-কে মৃতদের সাথে দেখেছেন। মে’রাজ সম্পর্কিত হাদীসটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেটা খুলে দেখে নাও। তাতে ঈসা (আ.)-এর বর্ণনা মৃতদের সাথে এসেছে না অন্য কোন ভাবে? তিনি (স.) যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.), মূসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের (আ.) দেখেছেন তদ্রুপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও দেখেছেন। তাদের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র ছিল না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত মূসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন এ বিষয়কে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। রূহ কবযকারী তাদের অন্য জগতে পৌঁছে দিয়েছে তথাপি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জীবিত সশরীরে কীভাবে আকাশে চলে গেল। এ সাক্ষ্যগুলো একজন সত্যিকার মুসলমানের জন্য অল্প নয়, যথেষ্ট।

অতঃপর অন্য হাদীসগুলোতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স ১২০ বা ১২৫ বছর বলা হয়েছে। এই সকল বিষয়গুলির উপর নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে তাৎক্ষণিকভাবে এ সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া যায় যে, মসীহ্ জীবিত আকাশে চলে গিয়েছে-এটা তাকওয়া বিরোধী। এ ছাড়া এর কোন পূর্ব-দৃষ্টান্তও নেই এবং বিবেকও এই সিদ্ধান্তই দিচ্ছিল। কিন্তু পরিতাপ! ঐ সকল লোক বিন্দু পরিমাণ ভ্রুক্ষেপ করে নি এবং খোদা ভীতির সঙ্গে কাজ না করে তৎক্ষণাত আমাকে “দাজ্জাল” বলে দিল। চিন্তা করার বিষয় যে, এটা কি সামান্য ব্যাপার ছিল? পরিতাপ।

অতঃপর যখন কোন আপত্তি রইল না তখন বলে দিল যে, মধ্য যুগে ‘ইজমা’

হয়েছে। আমি বলছি, কখন? প্রকৃত 'ইজমা' তো সাহাবাদের 'ইজমা' ছিল। এরপর যদি কোন 'ইজমা' হয়ে থাকে তাহলে এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করে দেখাও। আমি যথার্থ বলছি, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিষয়। মসীহ্ (আ.)-এর জীবিত থাকার উপর কখনো 'ইজমা' হয়নি। তারা পুস্তক খুলে দেখে নি নতুবা তারা জেনে যেত যে, সূফীগণ মৃত্যুতে বিশ্বাসী। তারা দ্বিতীয় আগমনকে বুরূযী রূপে বিশ্বাস করেন।

মোট কথা যেভাবে আমি আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা করি তদ্রুপ আমি আঁ-হযরত (স.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করছি কারণ, তাঁর (স.) জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এ সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরই কল্যাণ এবং বরকতের ফলে সাহায্যসমূহ হচ্ছে। আমি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছি এবং এটা আমার ধর্ম ও বিশ্বাস যে **আঁ-হযরত (স.)-এর অনুকরণ এবং পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং আশীষ লাভ করতে পারে না।**

অতঃপর এই সাথে আমি যদি আরো একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণনা না করি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এমন এক রাজ্য এবং শাসন ব্যবস্থায় জন্ম দিয়েছেন যা সর্ব দিক থেকে শান্তি দায়ক। তারা আমাদেরকে স্বীয় ধর্মের প্রচার এবং প্রকাশনার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এই বরকতপূর্ণ যুগে আমাদের জন্য প্রত্যেক ধরনের উপকরণ সহজলভ্য। এ থেকে বড় স্বাধীনতা আর কি হবে যে, আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করছি তথাপি কেউ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে না। অথচ এর পূর্বে এক সময় ছিল যার অবলোকনকারী এখনও বিদ্যমান আছেন। তখন কোন মুসলমান স্বীয় মসজিদে আযান পর্যন্ত দিতে পারত না অন্যান্য বিষয় তো দূরের কথা। হালাল জিনিস খেতে বাধা দেয়া হত অথচ এ বিষয়ে নিয়ম অনুযায়ী কোন তদন্ত ও হত না। এটা আল্লাহ্‌তা'লার দয়া এবং কৃপা যে, আমরা এমন এক রাজ্যে বাস করছি যা এ সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র। অর্থাৎ ইংরেজ রাজ্য যা শান্তি প্রিয়। তাদের ধর্মীয় বিরোধে কোন আপত্তি নেই এবং তাদের নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক ধর্ম স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ্‌তা'লা যেহেতু প্রত্যেক জায়গায় আমার প্রচার পৌঁছানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এ জন্য তিনি আমাদেরকে এ রাজ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে আঁ-হযরত (স.) 'নওশিরওয়ান' (ইরানের এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ) রাজ্যের প্রশংসা করেছেন

তদ্রুপ আমরা এ রাজ্যের প্রশংসা করছি। এটি নিয়মের কথা যে, খোদাতা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি যেহেতু ইনসাফ এবং সততা নিয়ে আসে এ জন্য তার আগমনের পূর্বেই ইনসাফ এবং সততা জারী হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। আমি বিশ্বাস করি সেই রোমরাজ্য যা মসীহ্ (আ.)-এর যুগে ছিল, যদিও সেটি এবং এটির আইনের মিল আছে তথাপি এ রাজ্য মর্যাদার দিক থেকে উৎকৃষ্ট এবং উত্তম। এ রাজ্যের আইন কারো কাছে গোপন নেই। ইনসাফ এটিই যে, তুলনামূলকভাবে দেখলে বুঝা যাবে রোম রাজত্বে অবশ্যই দমন নীতি ছিল। সেই জন্য ইহুদীদের ভয়ে খোদাতা'লার পবিত্র এবং নির্বাচিত মসীহ্ (আ.)-কে কারারুদ্ধ করা কাপুরুষতা ছিল। এ ধরনের মোকদ্দমা আমার উপরও হয়েছিল। মসীহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে তো ইহুদীরা মোকদ্দমা করেছিল কিন্তু এ রাজ্যে আমার বিরুদ্ধে যিনি মোকদ্দমা করেন তিনি সম্মানিত পাদ্রী এবং ডাক্তার ছিলেন। অর্থাৎ ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক তিনি আমার উপর হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি পূর্ণভাবে সাক্ষী উপস্থাপন করেছিলেন। এমন কি এ সিলসিলার চরম বিরোধী মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসেইন বাটালবীও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় এবং মোকদ্দমা পূর্ণভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এ মোকদ্দমা গুরদাসপুরে ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাসের এজলাসে ছিল। তিনি সম্ভবত; এখন সিমলায় আছেন। তার সমীপে মোকদ্দমা সুনিপুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো ভাবে সমস্ত সাক্ষী দেয়া হয়। এমন অবস্থা এবং পরিস্থিতিতে কোন বিজ্ঞ আইনবিদ ও বলতে পারে না যে, আমি নিরাপরাধ সাবস্ত হবে। সময় এবং পরিস্থিতির চাহিদানুযায়ী এটিই উচিত ছিল যে, আমাকে সেশন সোপর্দ করে দেয়া হতো আর সেখান থেকে ফাঁসির আদেশ আসত অথবা কালা পানির শাস্তি দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যেভাবে আমাকে মোকদ্দমার পূর্বে সংবাদ দিয়েছিলেন আর সেই অনুযায়ী এটি সময়ের পূর্বে প্রকাশও করে দিয়েছিলাম যে, আমি নিরাপরাধ সাব্যস্ত হব। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার জামাতের একটি বড় অংশের জানা ছিল। অতএব মোকদ্দমা যখন এ পরিস্থিতিতে পৌঁছে তখন শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীরা এ ধারণা করে যে, বিচারক আমাকে সেশন সোপর্দ করে দিবে। এমতাবস্থায় তিনি (বিচারক) পুলিশ ক্যাপ্টেনকে বলেন, আমার হৃদয়ে এ ধারণা আসছে যে, এ মোকদ্দমা বানোয়াট। আমার হৃদয় এটিকে বিশ্বাস করে

না যে, বাস্তবে এমন চেষ্টা করা হয়েছিল আর তিনি (মসীহ্ মাওউদ) ডাক্তার ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। আপনি পুনরায় এটি তদন্ত করুন। এটি সেই সময় ছিল যখন আমার বিরুদ্ধবাদীরা কেবল প্রত্যেক ধরনের পরিকল্পনাতেই লেগে ছিল না বরং যাদের দোয়া কবুলিয়তের দাবী ছিল তারা দোয়ায়ও রত ছিল। তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিল যেন আমি শাস্তি পেয়ে যাই। কিন্তু খোদাতা'লার মোকাবেলা কে করতে পারে? আমি জানি ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের নিকট কতক সুপারিশও এসেছিল কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বললেন যে, আমার দ্বারা এমন ঘৃণ্য কাজ সম্ভব নয়।

সুতরাং পুনরায় যখন এ মোকদ্দমা তদন্তের জন্য ক্যাপ্টেন লিমারচান্ডের উপর দায়িত্ব দেয়া হ'ল তখন ক্যাপ্টেন সাহেব আব্দুল হামিদকে ডেকে বলেন, তুমি সত্য সত্য বল। আব্দুল হামীদ সেই ঘটনাই পুনরাবৃত্তি করে যা সে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সম্মুখে বর্ণনা করেছিল। তাকে শেখানো হয়েছিল, বর্ণনায় যদি সামান্য তারতম্য হয় তাহলে তুমি ধরা পড়বে। এজন্য সে তা-ই বলতে থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে বলেন যে, তুই তো পূর্বেও এ বর্ণনাই দিয়েছিস, সাহেব (ডেপুটি কমিশনার) এতে সন্তুষ্ট নন। কেননা তুই সত্য সত্য বলছিস না। পুনরায় যখন ক্যাপ্টেন লিমারচান্ড তাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন সে ক্রন্দনরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন লিমারচান্ডের পায়ে পড়ে যায় এবং বলতে থাকে যে, আমাকে রক্ষা করুন। ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হাঁ বল। এতে সে মূল ঘটনা প্রকাশ করে। সে পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দেয় যে আমাকে হুমকি দিয়ে এই বিবৃতি বলানো হয়েছিল। মির্যা সাহেব কখনোই আমাকে হত্যার জন্য পাঠান নি। ক্যাপ্টেন সাহেব এ বর্ণনা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তিনি ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম পাঠান যে, আমরা মোকদ্দমার প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করেছি। অতএব এ মোকদ্দমা পুনরায় গুরদাসপুরে পেশ করা হয়। সেখানে ক্যাপ্টেন লিমারচান্ড সাহেব থেকে হলফ নেয়া হয়। তিনি তার হলফিয়া বর্ণনা লিপিবদ্ধ করান। আমি দেখছিলাম যে, ডেপুটি কমিশনার প্রকৃত ঘটনা উন্মোচিত হওয়ায় বড় আনন্দিত ছিলেন। এছাড়া ঐ সকল খৃষ্টানদের উপর বড় ক্রোধান্বিত ছিলেন যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন যে, আপনি

ঐ সকল খৃষ্টানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারেন। আমি যেহেতু মামলবাজিকে ঘৃণা করি সেহেতু আমি বলি যে, আমি মোকদ্দমা করতে চাই না। **আমার মোকদ্দমা আকাশে দায়ের করা আছে**। এতে সে সময়ই ডগলাস সাহেব সিদ্ধান্ত লেখেন। সেই দিন ব্যাপক লোক সমাগম হয়েছিল। তিনি সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় আমাকে বলেন, **আপনাকে অভিনন্দন। আপনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়েছেন**।

এখন বল! এ প্রশাসনের এটি কেমন বৈশিষ্ট্য যে, ন্যায় এবং ইনসাফের জন্য নিজ ধর্মের একজন নেতা এবং অন্য কোন বিষয়েরও পরওয়া করে নি। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, সেই সময় তো এক জগৎ আমার শত্রু ছিল। বাস্তবে এটিই হয়ে থাকে। পৃথিবী যখন কষ্ট দেয়া শুরু করে তখন চতুর্দিক হতেই আঘাত এসে থাকে। খোদাতা'লাই নিজের সত্যবাদী বান্দাদের রক্ষা করেন।

অতঃপর আমার উপর জনাব ডুই-এর একটি মোকদ্দমা হয়েছিল, ট্যাক্স -এরও একটি মোকদ্দমা হয়েছিল। তথাপি খোদাতা'লা আমাকে সমস্ত মোকদ্দমা হতে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেছেন। শেষে করমদীনের মোকদ্দমা হয়েছিল। এ মোকদ্দমায় আমার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং এটি মনে করা হয় যে, এখন এ সিলসিলা শেষ হয়ে যাবে। বাস্তবে এই সিলসিলা যদি আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে না হতো এবং তিনি এর সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য না দাঁড়াতেন তবে এর নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে কোন সন্দেহ ছিল না। দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত করমদীনকে সাহায্য করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ধরনের সহযোগিতা তাকে দেয়া হয়েছিল। এমন কি কতক মৌলভী উপাধি প্রাপ্ত আমার বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমায় সেই সাক্ষ্য দেয় যা পরিপূর্ণভাবে সত্য বিরোধী ছিল। এতটুকু পর্যন্ত বলে যে, তুমি জিনাহ্‌কার, পাপিষ্ঠ এবং নরাধম (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক- অনুবাদক)। এ সত্ত্বেও তারা মুত্তাকী। এ মোকদ্দমা দীর্ঘ সময় ব্যাপী চলতে থাকে। সে সময়ে অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হয়। সব শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি হিন্দু ছিলেন, আমাকে ৫০০ (পাঁচ শত) রূপী জরিমানা করেন। কিন্তু খোদাতা'লা পূর্বেই আমাকে এ সংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন,

"উচ্চ আদালত তাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করে দিয়েছে।"

এজন্য সে আপীল যখন ডিভিশনাল জজের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি তাৎক্ষণিক খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতার মাধ্যমে মোকদ্দমার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বলেন যে, আমি করমদীনের ব্যাপারে যা লিখেছিলাম তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। অর্থাৎ আমার সেটি লেখার অধিকার ছিল। সুতরাং তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তা প্রকাশ হয়ে গিযেছে। সবশেষে তিনি আমাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেছেন এবং জরিমানা ফেরত দিয়েছেন। প্রাথমিক আদালতকেও উপযুক্ত সতর্ক করেছেন কেন এ মোকদ্দমা এত সময় পর্যন্ত রাখা হলো? বস্তত আমার বিরুদ্ধবাদীরা আমাকে ধ্বংস এবং পদদলিত করার জন্য যখন কোন সুযোগ পেয়েছে তখন তারা বিন্দু মাত্র কার্পণ্য করে নি এবং কোন ক্রুটি করে নি। তথাপি আল্লাহ্‌তা'লা কেবল স্বীয় ফযল দ্বারা আমাকে প্রত্যেক আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। তদ্রুপ যেরূপ তিনি নিজের রসূলদের রক্ষা করে এসেছেন। আমি এ ঘটনাগুলোকে সামনে রেখে অত্যন্ত জোরালোভাবে বলছি যে, এ গভর্নমেন্ট ঐ রোম গভর্নমেন্ট থেকে অনেক উত্তম যার সময়ে মসীহ্ (আ.)-কে কষ্ট দেয়া হয়েছিল। গভর্ণর পিলাত যার সম্মুখে প্রথমে মোকদ্দমা পেশ হয় তিনি বস্তুতঃ মসীহ (আ.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর বিবিও মসীহ্ (আ.)-এর শিষ্য ছিলেন। তথাপি তিনি মসীহ্ (আ.)-এর রক্তে নিজের হাতকে রঞ্জিত করেছেন অথচ তিনি তাঁর শিষ্য এবং গভর্ণর ছিলেন। তিনি সেই সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেন নি যা ক্যাপ্টেন ডগলাস করেছিলেন। সেখানে মসীহ্ (আ.) নিষ্পাপ ছিলেন আর এখানে আমি ও নিষ্পাপ।

আমি সত্য সত্যই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি যে, আল্লাহ্‌তা'লা সত্যের জন্য এ জাতিকে একটি সাহস দিয়েছেন। সুতরাং আমি এ জায়গায় মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তাদের কর্তব্য তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে এ সরকারের আনুগত্য করে।

এটা ভাল করে স্মরণ রাখবে, যে ব্যক্তি তার উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে খোদাতা'লারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারে না। যে পরিমাণ শান্তি এবং আরাম এ যুগে রয়েছে অর দৃষ্টান্ত হয় না। রেল, টেলিফোন, ডাকঘর, পুলিশ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাগুলো দেখ যে এগুলোর মাধ্যমে কি ধরনের উপকার হচ্ছে। বল, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর পূর্বে এমন আরাম

এবং প্রশান্তি ছিল কি? অতঃপর নিজেই বিচার কর, আমাদের জন্য শত সহস্র কৃপা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন কৃতজ্ঞ হব না। অধিকাংশ মুসলমান আমার উপর আপত্তি করে, তোমাদের সিলসিলায় এ দোষ রয়েছে যে, তোমরা জেহাদ রহিত করেছ। পরিতাপ! ঐ সকল নির্বোধরা কেবল জেহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ইসলাম এবং আঁ-হযরত (স.)-কে কলঙ্কিত করছে। আঁ-হযরত (স.) কখনো ধর্ম প্রচারের জন্য তরবারি ধারণ করেন নি। তার (স.) এবং তাঁর জামাতের উপর যখন বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাঁর (স.) নিষ্ঠাবান পুরুষ ও মহিলা অনুসারীদের শহীদ করা হয় অতঃপর তাঁকে (স.) মদীনা পর্যন্ত ধাওয়া করা হয় তখন তিনি (স.) মোকাবেলার নির্দেশ লাভ করেন। তিনি (স.) তরবারি ধারণ করেন নি বরং শত্রুরা তরবারি উঠিয়েছিল। অনেক সময় যালেম স্বভাবের কাফের (অবিশ্বাসী) তাঁকে (স.) মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তাক্ত করেছিল তথাপি তিনি (স.) মোকাবেলা করেন নি। ভাল করে স্মরণ রাখবে, ইসলামে তরবারি উঠানো যদি ফরয হতো তাহলে আঁ-হযরত (স.) মক্কাতেই তরবারি ধারণ করতেন, কিন্তু তা হয় নি। তরবারির যে বর্ণনা আছে তা সেই সময় ধারণ করা হয়েছিল যখন অনিষ্টকারী কাফেররা তরবারি নিয়ে মদীনা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সেই সময় তাদের হাতে তরবারি ছিল। এখন আমার বিরুদ্ধে তরবারি নয় মিথ্যা সংবাদ রটনা এবং ফতোয়ার মাধ্যমে বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কেবল কলম দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। অতঃপর যে কলমের জবাব তরবারি দিয়ে দেয় সে নির্বোধ এবং যালেম বৈ অন্য কিছু নয়?

আঁ-হযরত (স.) কাফেরদের সীমাতিরিক্ত নির্যাতন এবং যুলুমের সময় তরবারি ধারণ করেছিলেন এ বিষয়টিকে কখনো ভুলবে না। সেই হেফাযত আত্মরক্ষামূলক হেফাযত বলে বিবেচিত, যা সিদ্ধ। এক চোর যদি ঘরে প্রবেশ করে আর সে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে চায় তখন সে চোরকে নিজের রক্ষার খাতিরে মেরে ফেলা অন্যায় নয়।

সুতরাং অবস্থা যখন এমন আকার ধারণ করে যে, আঁ-হযরত (স.)-এর ফিদায়ী (আত্ম বিসর্জনকারী) সেবকগণ এবং দুর্বল মুসলমান মহিলাদের অত্যন্ত নির্মম ও নির্লজ্জতার সঙ্গে শহীদ করা হয়েছিল তখন তাদের শাস্তি দেয়া কি উচিত ছিল না। সে সময় আল্লাহ্‌তা'লা যদি চাইতেন ইসলামের

অস্তিত্ব মিটে যাক তাহলে অবশ্যই এমনটি হতে পারত, তরবারির নাম আসত না কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন যেন ইসলাম দুনিয়াতে প্রসার লাভ করে এবং তা পৃথিবীর মুক্তির কারণ হয়, তাই আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধারণ করা হয়েছিল। আমি দাবীর সঙ্গে বলছি ইসলামের সে সময় তরবারি ধারণ করা কোন নিয়ম, ধর্ম এবং চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তির কারণ হতে পারে না। যারা এক গালে থাপ্পর খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেয়ার শিক্ষা দেয় তারাও ধৈর্য ধারণ করতে পারত না। যাদের নিকট পোকাকে মারাও পাপ বলে বিবেচিত তারাও ধৈর্য ধারণ করতে পারত না। তাহলে ইসলামের উপর আপত্তি কেন করা হয়?

যারা বলে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে আমি ঐ সকল অজ্ঞ মুসলমানদেরকে এটিও পরিষ্কার বলছি যে, তারা নিস্পাপ নবীর (স.) উপর মিথ্যা আরোপ করছে এবং ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। ভাল করে স্মরণ রাখবে, ইসলাম সর্বদাই নিজের পবিত্র শিক্ষা, হেদায়াত, নিজের জ্যোতির্ময় ফলাদি, বরকত এবং মো'যেজার মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। আঁ-হযরত (স.)-এর মহান নিদর্শনাবলী এবং তাঁর চরিত্রের পবিত্র করণের বৈশিষ্ট্যাবলী একে প্রসারিত করেছে। সেই সকল নিদর্শন এবং বৈশিষ্ট্যাবলী শেষ হয়ে যায় নি বরং সবসময় এবং সর্বদা প্রত্যেক যুগে সতেজ বিদ্যমান আছে। এ কারণেই আমি **আমাদের নবী (স.)-কে জীবিত নবী** বলি।

এ জন্য তাঁর (স.) শিক্ষা এবং হেদায়াতসমূহ সর্বদা নিজের ফল দিতে থাকে। ভবিষ্যতে ইসলাম যখন উন্নতি করবে তখন এর পথ এটাই হবে অন্য কোন পথ নয়। সুতরাং ইসলামের প্রসারের জন্য যখন কখনও তরবারি ধারণ করা হয় নি তখন এমন ধারণা করা পাপ, কেননা এখন সকলেই শান্তিতে বসবাস করছে। নিজের ধর্মের প্রসারের জন্য যথেষ্ট মাধ্যম এবং সামগ্রী বিদ্যমান আছে। আমাকে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য আপত্তিকারীগণ ইসলামের উপর আক্রমণ করার সময় কখনই বাস্তবতায় চিন্তা করে নি। তারা যদি বাস্তবতায় চিন্তা করত তাহলে দেখতে পেত যে, সে সময় সকল বিরুদ্ধবাদী ইসলাম এবং মুসলমানদের সমূলে বিনাশের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। সবাই মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছিল এবং কষ্ট দিচ্ছিল। সে সকল দুঃখ এবং কষ্টের মোকাবেলায়

তারা যদি নিজেদের আত্মরক্ষা না করত তাহলে কি করত? কুরআন শরীফে এই আয়াত বিদ্যমান রয়েছে যে,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ

'উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বেআন্নাহুম যুলিমূ' (সূরা হাজ্জ 22 ঃ 40)

(অর্থঃ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হ'ল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে -অনুবাদক)। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই নির্দেশ তখন দেয়া হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সময় এই অনুমতি ছিল, অন্য সময়ের জন্য এ নির্দেশ নয়। তবে মসীহ্ মাওউদ এর জন্য এ নিদর্শন নির্ধারিত করা হয়েছে যে, 'ইয়াযাউল হারবা' (মুসলিম প্রথম খন্ড, কিতাবুল ঈমান ও মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থঃ ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন।

সুতরাং তার সত্যতার নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না। এর কারণ এটাই যে, সে যুগে বিরুদ্ধবাদীরা ধর্মীয় যুদ্ধ ছেড়ে দিবে। তবে এ মোকাবেলা ভিন্ন একটি ধরন এবং পদ্ধতি অবলম্বন করে নিয়েছে আর তা হচ্ছে কলমের সাহায্যে ইসলামের উপর আপত্তি করা। খৃষ্টানদের দেখ, তাদের এক একটি পুস্তিকা পঞ্চাশ, পঞ্চাশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রত্যেক ধরনের চেষ্টা চলছে মানুষ যেন ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। সুতরাং এর মোকাবেলার জন্য আমাদের কলমের সাহায্যে কাজ নেওয়া উচিত না তীর চালানো উচিত। এ সময় কেউ যদি এমন ধারণা করে তবে তার চেয়ে বড় নির্বোধ এবং ইসলামের শত্রু আর কে হবে? এ ধরনের কথা বলা ইসলামকে কলঙ্কিত করা ছাড়া আর কি। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়েও এ ধরনের প্রচেষ্টা করে না তখন কেমন আশ্চর্য এবং পরিতাপ হবে যে, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তরবারির নাম নিব? এখন তোমরা কাউকে তরবারি দেখিয়ে বল মুসলমান হয়ে যাও নতুবা হত্যা করব। তারপর দেখ ফল কী হয়? সে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে তরবারি ধারণ করার মজা দেখাবে।

এ ধারণাসমূহ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এগুলোকে মস্তিষ্ক থেকে বের করে দেয়া উচিত। এখন ইসলামের উজ্জ্বল এবং আলোকিত চেহারা প্রদর্শন করার

সময় এসে গিয়েছে এটি সেই যুগ যখন ইসলামের জ্যোর্তিময় চেহারায় লাগানো সমস্ত আপত্তিসমূহ দূরীভূত করা হবে। আমি আক্ষেপের সঙ্গে এটাও প্রকাশ করছি যে, খোদাতা'লা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্য মুসলমানদের যে সুযোগ দিয়েছেন এবং রাস্তা খুলেছেন সেটাকেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখা ও অস্বীকার করা হয়েছে।

আমি আমার রচনাবলীর মাধ্যমে এ পদ্ধতিকে পূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছি যা ইসলামকে সফল এবং অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়দানকারী। আমার রচনাবলী ইউরোপ এবং আমেরিকায় যায়। খোদাতা'লা সে জাতিকে যে দূরদৃষ্টি দিয়েছেন তা দিয়ে তারা এ বিষয়কে বুঝে নিয়েছে। অথচ আমি যখন একজন মুসলমানের সম্মুখে এ গুলোকে উপস্থাপন করি তখন তার মুখে ফেনা এসে যায়। সে যেন উন্মাদ হয়ে যায় এবং হত্যাও করতে চায়। অথচ কুরআন শরীফের শিক্ষা তো এটাই ছিল,

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

'ইদ্‌ফা' বিল্লাতী হিয়া আহসান' (সূরা হামীম আস্‌সাজদা 41ঃ 35)

[অর্থঃ অতএব তুমি সেটি দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম। -অনুবাদক।] এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতিপক্ষ যদি শত্রুও হয় তাহলে নম্রতা এবং উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে যেন বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর আরাম ও স্বাচ্ছন্দেও এই কথাগুলোকে শ্রবণ করে। **আমি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি তার পক্ষ থেকে এসেছি।** তিনি ভাল করে জানেন যে, আমি মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক নই। তোমরা যদি আমার খোদাতা'লার কসম খাওয়া এবং ঐ নিদর্শনসমূহ যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন তা দেখার পরও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি তোমাদেরকে খোদাতা'লার কসম দিচ্ছি, এমন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে প্রতিদিন আল্লাহ্‌তা'লার উপর প্রতারণা এবং মিথ্যা আরোপ করছে তথাপিও আল্লাহ্‌তা'লা তার সাহায্য এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। উচিত তো এটাই ছিল যে, তাকে ধ্বংস করতেন কিন্তু বিষয় এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি। আমি সত্যবাদী এবং তার পক্ষ থেকে এসেছি। অথচ আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বলা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা আমার বিরুদ্ধে জাতির সৃষ্টি করা প্রত্যেক মোকদ্দমা এবং বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করছেন এবং সাহায্য করছেন। এমন সাহায্য

যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি আমার সত্যতাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থাপন করছি। যদি তোমরা এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পার তাহলে কর যে কিনা মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ্‌তা'লা সম্পর্কে প্রতারণা করে, তথাপি আল্লাহ্‌তা'লা তাকে এমন সব সাহায্য করছেন আর এত ব্যাপক সময় পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছেন এবং তার আকাঙ্খা সমূহ পূর্ণ করেছেন।

নিশ্চিত জেনে নিও খোদাতা'লার প্রেরিতগণ ঐ সমস্ত নিদর্শন এবং সমর্থনসমূহের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে থাকেন যা খোদাতা'লা তাদের জন্য প্রদর্শন করেন। আমি আমার কথায় সত্য। খোদাতা'লা যিনি হৃদয় সমূহকে দেখেন তিনি আমার হৃদয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে জানেন এবং জ্ঞাত। তোমরা কি এতটুকু বলতে পার না যা ফেরাউন জাতির এক ব্যক্তি বলেছিল ঃ-

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ

'ইয়্যাকু কাযিবান্ ফা আ'লাইহি কাযিবুহু ওয়া ইয়্যাকু সাদেকাঁই ইউসিব্‌কুম বা'যুল্লাযী ইয়া'যিদ্‌কুম' (সূরা মু'মিন 40ঃ 29)

(অর্থঃ এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে তার মিথ্যার প্রতিফল তারই উপর বর্তিবে আর যদি সে সত্যবাদী হয় তা হলে সে তোমাদেরকে যে সমস্স্ত আযাব সম্পর্কে) ভয় প্রদর্শন করছে সেগুলোর কিছু অংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তাবে- অনুবাদক) তোমরা কি এ বিশ্বাস কর না যে, আল্লাহ্‌তা'লা মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তোমরা সকলে মিলে আমার উপর যে আক্রমণ কর খোদাতা'লার গজব এর চেয়ে অনেক ব্যাপক হয়ে থাকে। অতঃপর তাঁর গজব থেকে কে রক্ষা করতে পারে? আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি তাতে এ দিকটিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না করে আংশিকভাবে পূর্ণ করে দিবেন বলেছেন। এর মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত আছে, প্রজ্ঞা এই যে সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। সেগুলো তওবা, ইস্তিগফার এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে রহিত হয়ে থাকে।

ভবিষ্যদ্বাণী দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি ওয়াদা সম্পর্কিত যেমন ঃ-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

'ওয়াদা ল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম' (সূরা নূর 24 ঃ 56)

(অর্থঃ তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন - অনুবাদক) আহলে সুন্নত বিশ্বাস রাখে যে, এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লঙ্ঘিত হয় না। কেননা খোদাতা'লা 'করীম' (দয়ালু)। তবে সর্তকীকরণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে তিনি সতর্ক করে ছেড়েও দেন। এ কারণে যে তিনি 'রহীম' (বার বার কৃপাকারী)। ঐ ব্যক্তি বড় নির্বোধ এবং ইসলাম থেকে অনেক দূরে, যে বলে সতর্কীকরণের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে, সে কুরআন করীমকে ত্যাগ করে। কেননা কুরআন করীম তো এটাই বলে যে,

يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ

'ইউসিবকুম বা 'যুল্লাযী ইয়া'য়িদুকুম' (সূরা মু'মিন 40 ঃ 29)

(অর্থঃ সে তোমাদেরকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করছে সে গুলোর কিছু অংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। - অনুবাদক]

পরিতাপ! অনেক ব্যক্তি মৌলভী আখ্যা পাওয়া সত্ত্বেও কুরআন, হাদীস এবং নবীদের সুন্নত সম্পর্কে অবগত নয়। মুখে বিদ্বেষের ফেনা আর তাই তারা প্রতারণা করে। স্মরণ রাখা উচিত الكريم اذا وعد وفى ("আল কারীমু ইযা উ'য়িদু ফী') বার বার কৃপাকারীর জন্য আবশ্যক যে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করে ক্ষমা করে দেন। একদা এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল এবং তার অপরাধও প্রমাণিত ছিল। সেই মোকদ্দমা একজন ইংরেজের নিকট ছিল। সে হঠাৎ চিঠি পায় যে, তাকে দূরে কোথাও বদলী করা হয়েছে। সে এতে দুঃখিত হয়। অপরাধী ব্যক্তি বৃদ্ধ ছিল। বিচারক কেরানীকে বলে, এই অপরাধী কারাগারেই মৃত্যু বরণ করবে। কেরানী বলে, হুযুর সে ছেলেমেয়েসম্পন্ন। এতে সে ইংরেজ বলে, দন্ড লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এখন আর কি হতে পারে। অতঃপর বলে আচ্ছা দন্ডটি কেটে দাও। এখন চিন্তা কর ইংরেজের তো দয়া হতে পারে। খোদাতা'লার কি (দয়া) হতে পারে না?

অতঃপর এ বিষয়েও চিন্তা কর দান খয়রাত কেন জারি আছে, প্রত্যেক জাতিতে এর প্রচলন রয়েছে। প্রকৃতগতভাবে মানুষ কষ্ট এবং দুর্যোগের সময় সদকা করতে চায়, খয়রাত করে এবং বলে, ছাগল দাও, কাপড় দাও, এটা দাও ওটা দাও। এগুলোর মাধ্যমে যদি দুর্যোগ দূরীভূত না হয় তাহলে মানুষ কেন বাধ্য হয়ে এমন করে? এটি দ্বারা দুর্যোগ দূরীভূত হয়ে থাকে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর থেকে এ বিষয়টি সম্মিলিতভাবে প্রমাণিত। আমি নিশ্চিত জানি, এটা কেবল মুসলমানদের বিশ্বাস নয় বরং ইহুদী, খৃষ্টান এবং হিন্দুদেরও বিশ্বাস। আমার মতে সমগ্র পৃথিবীর কেউ এর অবিশ্বাসী নয়। এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এটি (দুর্যোগ) দূরীভূত হয়ে যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য কেবল এটাই, ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ নবীকে দেয়া হয় আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত নয় বরং তা গোপন থাকে। খোদার সেই ইচ্ছা যদি নবীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে সেটা ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী যদি পরিবর্তিত হতে না পারে তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাও সদকা এবং খয়রাতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কেননা সতর্কীকরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ জন্যই (আল্লাহ্‌তা'লা) বলেন ঃ-

وَاِنۡ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبۡكُمۡ بَعۡضُ الَّذِىۡ يَعِدُكُمۡ

'ওয়া ইয়্যাকু সাদেকাঁই ইউসিব্‌কুম বা'বুল্লাযী ইয়া'য়িদুকুম' (সূরা মু'মিন 40 ঃ 29) (অর্থঃ এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যার প্রতিফল তারই উপর বর্তিবে।- অনুবাদক) খোদাতা'লা এখানে নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আঁ-হযরত (স.)-এর কতক ভবিষ্যদ্বাণীও পরিবর্তিত হয়েছিল। আমার যদি কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন আপত্তি করা হয় তাহলে আমাকে এর জবাব দাও। এ বিষয়ে আমাকে যদি মিথ্যা প্রতিপাদন কর তাহলে আমার নয় বরং আল্লাহ্‌তা'লার উপর মিথ্যা প্রতিপাদনকারী সাব্যস্ত হবে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এটা সমস্ত আহলে সুন্নত জামাত এবং সমগ্র দুনিয়ার স্বীকৃত বিষয় যে, আকুতি মিনতির মাধ্যমে আযাবের ওয়াদা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। হযরত ইউনুস (আ.)-এর দৃষ্টান্ত কি তোমরা ভুলে গেছ? হযরত ইউনুস

(আ.)-এর জাতি থেকে যে আযাব রহিত হয়েছিল তার কারণ কি? দুররে মনসুর ও অন্যান্য পুস্তকাদি দেখ। এ ছাড়া বাইবেলে ‘ইউহাননা’ নবীর অধ্যায় রয়েছে। নিশ্চিত আযাবের ওয়াদা ছিল কিন্তু ইউনুসের জাতি আযাবের পূর্বাভাস দেখে তওবা করেছিল এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে প্রত্যাবর্তীত হয়েছিল। খোদাতা’লা তাদের ক্ষমা করে দেন এবং আযাব রহিত হয়ে যায়। এদিকে ইউনুস (আ.) নির্দিষ্ট সময়ে আযাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। লোকদের নিকট সংবাদ জিজ্ঞেস করছিলেন। একজন জমিদারকে জিজ্ঞেস করেন, ‘নিনেভার’ অবস্থা কী? সে বলে, অবস্থা ভাল। তখন হযরত ইউনুস (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং বললেন, لن ارجع الی قومی کذابا (“লান আরযা’উ ইলা কাওমী কায্‌যাবান”) অর্থাৎ আমি আমার জাতির কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে ফেরৎ যাব না। এ দৃষ্টান্ত এবং কুরআন শরীফে শক্তিশালী সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে আমার প্রথম থেকে শর্ত সাপেক্ষ কোন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে আপত্তি করা তাকওয়া বিরোধী। মুত্তাকীর এটা নিদর্শন নয় যে, বিনা চিন্তা ভাবনায় মুখ থেকে কথা বের করবে এবং মিথ্যা প্রতিপাদনে তৈরী হবে।

হযরত ইউনুস (আ.) -এর ঘটনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং শিক্ষণীয়। সেগুলো পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, মনোযোগ সহকারে পড়। তাকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তিনি মাছের পেটে চলে যান তখন তাঁর তওবা গৃহীত হয়। হযরত ইউনুস (আ.)-এর উপর এ শাস্তি এবং ক্রোধ কেন হয়েছিল। কারণ সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রহিত করার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌তা’লাকে সর্বশক্তিমান মনে করেন নি। তবে তোমরা আমার ব্যাপারে কেন তাড়াহুড়া করছ? আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য সকল নবীদের মিথ্যা বলছ। স্মরণ রাখবে, খোদাতা’লার নাম ‘গফূর’ (ক্ষমাশীল) তা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন না কেন? জাতিতে এ ধরনের অনেক ভুল ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এ ভুল ভ্রান্তি সমূহের মধ্যে জেহাদ সম্পর্কিত ভুল ভ্রান্তিও রয়েছে। আমি আশ্চার্যান্বিত যে, আমি যখন বলি (বর্তমানে তরবারির) জেহাদ হারাম তখন তারা চোখ রাঙ্গিয়ে উঠে অথচ তারা নিজেরাই স্বীকার করে খুনী মাহদীর হাদীসগুলো সন্দেহযুক্ত। মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন বাটালভী এ সম্পর্কে পত্রিকা লিখেছেন এবং মিঞা নযীর হোসেইন দেহলভীর মতও এই ছিল। তিনি এ গুলোকে সঠিক মনে করেন না। তথাপি কেন আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়? সত্যি কথা এটাই মসীহ্ মাওউদ ও মাহদীর

কাজ হবে, তিনি ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত করবেন এবং কলম, দোয়া ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের সুনাম উন্নত করবেন। পরিতাপের বিষয় যে, মানুষের যে পরিমাণ দৃষ্টি দুনিয়ার দিকে সেই পরিমাণ দৃষ্টি ধর্মের দিকে নেই এ জন্য তারা এ বিষয় বুঝতে পারে না। তারা পৃথিবীর অনাচার ও অপবিত্রতায় নিমজ্জিত থেকে এ আকাঙ্খা কীভাবে রাখে যে, তাদের উপর কুরআন করীমের সূক্ষ্ম তত্ত্ব উন্মোচিত হবে। সেখানে তো পরিস্কার লেখা আছে যে,

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

"লা ইয়ামাস্‌সাহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারূন' (সূরা ওয়াকে'আ 56 ঃ 80)

(অর্থঃ পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ এটাকে স্পর্শ করবে না। - অনুবাদক) এ বিষয়ে মনোযোগ সহকারে চিন্তা কর। আমার আবির্ভূত হওয়ার কারণ কী?

আমার আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার এবং সহযোগিতা করা। এ থেকে এটা বোঝা উচিত নয় যে, আমি নতুন শরীয়ত শিক্ষা অথবা নতুন কোন নির্দেশ দেয়ার জন্য এসেছি অথবা আমার উপর নতুন কিতাব নাযেল হবে। কখনও নয়। কোন ব্যক্তি যদি এমন মনে করে তবে সে আমার দৃষ্টিতে বড় বেদীন এবং পথভ্রষ্ট। আঁ-হযরত (স.)-এর উপর শরীয়ত এবং নবুওয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কোন শরীয়ত আসতে পারবে না। কুরআন মজীদ 'খাতামুল কুতুব' এখন এতে বিন্দু বা নোক্তার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সম্ভব নয়। হাঁ এটা সত্য যে, আঁ-হযরত (স.)-এর বরকত ও কল্যাণ এবং কুরআন শরীফের শিক্ষা ও হেদায়াতের ফল শেষ হয়ে যায় নি। সেগুলোর সতেজতা সর্বযুগে বিদ্যমান। সেই কল্যাণ ও বরকতসমূহের প্রমাণের জন্য খোদাতা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। বর্তমানে ইসলামের যে অবস্থা তা গোপন নয়। সর্বসম্মতিক্রমে এটা স্বীকৃত যে, মুসলমানগণ সব ধরনের দুর্বলতা এবং অবনতির স্বীকার। প্রত্যেক দিক থেকে তারা নিচে যাচ্ছে। তারা মুখে বেশ বলে কিন্তু হৃদয় সাড়া দেয় না, ইসলাম এতীম হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা নিজের ওয়াদা অনুযায়ী আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি ইসলামের সমর্থন ও অভিভাবকত্ব করি। কেননা তিনি বলেছিলেন ঃ-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

“ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্‌ যিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিযুন’ (সূরা হিজ্‌র 15 ঃ 10)

[অর্থঃ নিশ্চয় আমরাই এ যিকর (কুরআন) নাযেল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হিফাযতকারী। - অনুবাদক] এখন যদি সাহায্য সহযোগিতা এবং হেফাযত না করা হয় তবে কখন সময় আসবে। এখন চৌদ্দ শত হিজরীতে সেই অবস্থা এসে গিয়েছে যা বদরের সময় হয়েছিল। যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা’লা বলেছেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

‘ওয়ালাকাদ্‌ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদরিঁও ওয়া আন্‌তুম আযিল্লাহ’ (সূরা আলে ইমরান 3ঃ 124)

[অর্থঃ এবং (ইতঃপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। - অনুবাদক] বস্তুত এ আয়াতে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রাখা ছিল। অর্থাৎ চৌদ্দশত হিজরীতে ইসলাম যখন দুর্বল ও অসহায় হয়ে যাবে সে সময় আল্লাহ্‌তা’লা স্বীয় হেফাযতের ওয়াদা অনুযায়ী ইসলামের সাহায্য করবেন। তবে কেন তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ যে, তিনি (আল্লাহ্‌) ইসলামের সাহায্য করছেন? আমার এ বিষয়ে দুঃখ নেই যে আমার নাম ‘দাজ্জাল’ ও ‘কায্‌যাব’ রাখা হয় এবং আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়। আমার সঙ্গে সে আচরণ করা আবশ্যক ছিল যা আমার পূর্বে প্রেরিতদের সঙ্গে করা হয়েছিল যেন আমিও পুরনো একটি সুন্নত থেকে অংশ পাই। যে দুঃখ এবং কষ্ট আমাদের প্রভু ও নেতা আঁ-হযরত (স.)-এর পথে এসেছিল আমি তো সেই দুঃখ এবং কষ্টের কিছু অংশ লাভ করি নি। তিনি (স.) ইসলামের জন্য সেই দুঃখ সহ্য করেছেন যা কলম লেখাতে এবং ভাষা বর্ণনা করতে অক্ষম। ঐ দৃষ্টান্ত নবীদের ইতিহাসে কারো জন্য পাওয়া সম্ভব নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি (স.) কত মহান এবং দৃঢ় সংকল্পের নবী ছিলেন। খোদাতা’লার সাহায্য ও সহযোগিতা যদি তার (স.) সঙ্গে না থাকতো তবে সেই দুঃখ-কষ্টের পাহাড়কে সহ্য করা অসম্ভব ছিল। অন্য কোন নবী হলে তিনি তা পারতেন না। কিন্তু যে ইসলামকে তিনি (স.) এত দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে প্রচার করেছেন সেই ইসলামের আজ যে অবস্থা হয়েছে আমি তা কীভাবে বর্ণনা করব?

ইসলামের অর্থ এটাই ছিল যে, মানুষ খোদাতা'লার ভালবাসা ও আনুগত্যে বিলীন হয়ে যাবে। একটি ছাগলের গর্দান যে ভাবে কসাই এর সামনে থাকে তদ্রুপ মুসলমানদের গর্দান খোদাতা'লার আনুগত্যের জন্য রেখে দেয়া উচিত। এতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, খোদাতা'লাকেই যেন একক এবং অংশীদারহীন জ্ঞান করে। আঁ-হযরত (স.) যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন এই একতা হারিয়ে গিয়েছিল এদেশও (ভারত উপমহাদেশ) আর্য সমাজিদের মূর্তিতে পূর্ণ ছিল। যেমন পন্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীও এটাকে স্বীকার করেছেন। এমন সময় এবং অবস্থাতে মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব আবশ্যক ছিল। এ যুগেও সেই যুগের ন্যায় মূর্তি পূজা, মানুষ-পূজা এবং নাস্তিকতা ছেয়ে গেছে। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও রূহ অবশিষ্ট নেই। ইসলামের মূল শিক্ষা ছিল খোদাতা'লার ভালবাসায় বিলীন হয়ে যাওয়া এবং খোদাতা'লা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে উপাস্য জ্ঞান না করা। আরও উদ্দেশ্য ছিল যে, মানুষ যেন দুনিয়ামুখী না হয়ে খোদামুখী হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম নিজের শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথমতঃ "হুকুকুল্লাহ্" (আল্লাহ্র হক) দ্বিতীয় "হুকুকুল ইবাদ" (বান্দার হক) "হুকুকুল্লাহ্" হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক মনে করা "হুকুকুল ইবাদ" হচ্ছে খোদাতা'লার সৃষ্টির সঙ্গে ভালবাসা রাখা। এ পদ্ধতি সঠিক নয় যে, কেবল ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাউকে কষ্ট দিবে। ভালবাসা এবং আচরণ ভিন্ন বিষয় আর ধর্মীয় বিরোধ ভিন্ন বিষয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে সেই দল যারা জেহাদ সম্পর্কে ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা কুফফারের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করাও সঠিক এবং বৈধ মনে করে। এ সকল লোক আমার সম্পর্কেও ফতওয়া দিয়েছে যে, তার সম্পদ লুট কর। এমনকি এতটুকু যে, তাদের স্ত্রীদের বের করে নিয়ে আস। অথচ ইসলামে এ অপবিত্র শিক্ষা ছিল না। ইসলাম তো একটি পবিত্র এবং স্বচ্ছ ধর্ম ছিল। ইসলামের দৃষ্টান্ত আমরা এভাবে দিতে পারি, পিতা যেমন নিজের পিতৃত্বের অধিকার চায় তেমনি তিনি চান সন্তানদের একে অপরের সঙ্গে যেন ভালোবাসা থাকে। তিনি চান না যে,একে অপরকে মারুক। ইসলামও যেখানে এটা চায় যে, কেউ যেন খোদাতা'লার শরীক না করে সেখানে এ-ও উদ্দেশ্য যে, মানব জাতির মধ্যে যেন ভালোবাসা এবং ঐক্য থাকে। এ কারণে ঐক্য সৃষ্টির জন্যই বা-জামাত নামাযে বেশী পুণ্য রাখা হয়েছে। অতঃপর এই ঐক্যকে কর্মে পরিণত করার জন্য এতটুকু হেদায়াত

এবং জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের মধ্যে সারি যেন সোজা আর একে অন্যের সঙ্গে মিলে দাঁড়ায় এবং পা সমূহও যেন সোজা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সবাই যেন এক ব্যক্তির নির্দেশ বহন করে। একজনের নূর যেন অন্য জনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। সেই পার্থক্য যেন না থাকে যার মাধ্যমে আত্মঅহমিকা এবং স্বার্থপরতা সৃষ্টি হয়।

এটি ভালো করে স্মরণ রাখবে, মানুষের মধ্যে এই শক্তি রয়েছে যে, সে একে অন্যের নূর আকর্ষণ করতে পারে। অতঃপর এ একত্বতার জন্য নির্দেশ রয়েছে যে, প্রতিদিনের নামায মহল্লার মসজিদে, সপ্তাহের নামায শহরের মসজিদে তারপর বৎসরের নামায সকলে একত্রিত হয়ে ঈদগাহে এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান বৎসরে একবার বায়তুল্লাহ্‌তে একত্রিত হয়। এ সকল নির্দেশের উদ্দেশ্য ঐ একত্বতাই।

আল্লাহ্‌তা'লা হক সমূহের দু'টি অংশ রেখেছেন একটি 'হুকুকুল্লাহ্‌' অন্যটি 'হুকুকুল ইবাদ'। কুরআন করীমে এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ্‌ বলেন ঃ-

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

'ফায্‌কুরুল্লাহা কা যিক্‌রিকুম আবায়াকুম আও আশাদ্দা যিক্‌রা' (সূরা বাকারা 2 ঃ 201)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজের বাপ দাদাকে স্মরণ করে থাক বরং এর চেয়ে বেশী। এখানে দুটি গোপন রহস্য রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র স্মরণকে বাপ-দাদার স্মরণের সঙ্গে সাদৃশ্য করা হয়েছে। এতে এ রহস্য রয়েছে যে বাপ দাদার ভালোবাসা প্রকৃতিগত এবং সত্তাগত হয়ে থাকে। দেখ! মা যখন সন্তানকে মারেন তখনও সে মা মা বলেই চিৎকার করে। অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে সেই শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে সে খোদাতা'লার সঙ্গে সত্তাগত ভালোবাসা সৃষ্টি করে। এ ভালোবাসার পর আপনা-আপনি আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়। এটি সূক্ষ্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের মূল অবস্থান যেখানে মানুষের পৌঁছানো উচিত। অর্থাৎ তার মধ্যে যেন আল্লাহ্‌তা'লার জন্য প্রকৃতিগত এবং সত্তাগত ভালোবাসার সৃষ্টি হয়ে যায়। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্‌ এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

'ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুবিল্ আদ্‌লি ওয়াল্ এহসানি ওয়া ইতায়িযিল্ কুরবা' (সূরা নাহল 16 ঃ 91)

(অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও উপকার সাধন করার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করার আদেশ দিচ্ছেন। - অনুবাদক) এ আয়াতে সেই তিন সোপানের বর্ণনা রয়েছে যা মানুষের অর্জন করা উচিত। প্রথম ধাপ হচ্ছে 'আদল' (ন্যায়), আদল হচ্ছে মানুষের প্রতিদানের বিনিময়ে পুণ্য করা। এটি পরিষ্কার বিষয় যে, এমন পুণ্য কোন উন্নত মর্যাদার বিষয় নয় বরং সবচেয়ে নিম্ন পর্যায় হচ্ছে, ন্যায় কর। যদি এই সোপানে উন্মত হও তবে পরবর্তী সোপান হচ্ছে "এহসান" (দয়া) -এর সোপান অর্থাৎ বিনা প্রতিদানে পুণ্য কর। তবে এ বিষয়টি যে, কেউ মন্দ করলে তার সাথে পুণ্য কর,কেউ এক গালে থাপ্পড় দিলে অন্যটি এগিয়ে দাও - এটি সঠিক নয়। স্মরণ রাখবে এ শিক্ষা সাধারণভাবে কর্মে সম্পাদন সম্ভব নয়। যেমন সাদী বলেছেন,

نکوئی بابداں کردن چناں است　　　که بد کردن برائے نیک مرداں

'নেকুই বা বাদাঁ কারদান চুনা আস্ত　কে বাদ কারদান বারয়ে নেক মারাদাঁ' (অর্থঃ দুষ্ট লোকদের সঙ্গে সদাচরণ করা এমনই যেমন পুণ্যবান লোকদের সঙ্গে মন্দ আচরণ করা। -অনুবাদক) এজন্য ইসলাম প্রতিশোধের সীমানায় যে উচ্চ মার্গের শিক্ষা দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম এর মোকাবেলা করতে পারবে না এবং সেটি হচ্ছে ঃ-

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ

'জাযাও সাইয়্যিয়াতিন সাইয়্যিয়াতুন্ মিস্‌লুহা ফামান আ'ফা ওয়া আস্‌লাহা' (সূরা শূরা 42 ঃ 41)

অর্থাৎ মন্দের শাস্তি সেই পরিমাণ মন্দই তবে যে ক্ষমা করে দেয়, এমন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে যে, সেই ক্ষমা সংশোধনের কারণ হয়। ইসলাম ভুলকে মাফ করার শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু এটা নয় যে, এ থেকে মন্দ

বৃদ্ধি পাবে।

বস্তুত "আদল" (ন্যায়) এর পর দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে 'এহসান' (দয়া) অর্থাৎ কোন প্রতিদান ছাড়া সাহায্য করা। তবে এ আচরণেও এক ধরনের স্বার্থপরতা থেকে থাকে, কোন না কোন সময় মানুষ সেই এহসান বা নেকীর খোটা দেয়। এ জন্য এর চেয়ে বড় এক শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی 'ইতায়ি যিল্ কুরবা' *(সূরা নাহল 16 ঃ 91)* আত্মীয়-স্বজনকে দান এর ধাপ। মা নিজের সন্তানের সঙ্গে যে আচরণ করেন তাতে তিনি কোন প্রতিদান, পুরস্কার এবং শ্রদ্ধার আকাঙ্খা করেন না। তিনি তার সঙ্গে যে পুণ্য করেন তা কেবল প্রকৃতিগত ভালোবাসায় করেন। বাদশাহ যদি নির্দেশ দেয় যে, তুমি তাকে দুধ দিবে না, সে যদি তোমার গাফলতির কারণে মারা যায় তবে তোমাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না বরং পুরস্কার দেয়া হবে। এ পরিস্থিতিতে সে বাদশাহের নির্দেশ মানার জন্য তৈরী হবে না বরং তাকে গাল মন্দ দিবে যে, সে আমার সন্তানের শত্রু। এর কারণ এই যে, তিনি (মা) প্রকৃতিগত ভালবাসায় এমনটি করছেন। এটি উচ্চ স্তরের শিক্ষা যা ইসলাম উপস্থাপন করে। এ আয়াত "হুকুকুল্লাহ্" এবং "হুকুকুল ইবাদ" দু'টিকেই পরিবেষ্টিত করে আছে। "হুকুকুল্লাহুর" দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা ন্যায়ের সাথে আল্লাহ্তা'লার ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন করছেন। যে আল্লাহ্র এ আনুগত্যের মর্যাদা থেকে উন্নতি করে তখন সে যেন এহ্সানের অনুবর্তিতায় ইতায়াত করে, কেননা সে মোহসেন, তার এহসানসমূহকে কেউ গণনা করতে পারে না। মোহ্সেন এর চরিত্র এবং অভ্যাসসমূহকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখলে এহসান সতেজ থাকে। এজন্য আঁ-হযরত (স.) এহসানের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমনভাবে আল্লাহ্তা'লার ইবাদত কর যেন আল্লাহ্কে দেখছ অথবা কমপক্ষে এটি যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। এ স্তর পর্যন্ত মানুষের মধ্যে একটি পর্দা থাকে। তবে এরপর হচ্ছে তৃতীয় স্তর, "ইতায়ি যিল্ কুরবা"। অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে তাঁর সত্তাগত ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে যায়। **"হুকুকুল ইবাদের"** দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এর অর্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি। আমি এ-ও বর্ণনা করেছি যে, কুরআন শরীফের এ শিক্ষা অন্য কোন কিতাব দেয় নি। কুরআনের এ শিক্ষা এমন পূর্ণাঙ্গীন যে কেউ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। অর্থাৎ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ

'জাযাও সাইয়্যিয়াতিন সাইয়্যিয়াতুন্ মিস্‌লুহা' (সূরা শূরা 42 ঃ 41)

এখানে ক্ষমার জন্য এ শর্ত রাখা হয়েছে, সে যেন সংশোধিত হয়। ইহুদী ধর্মের শিক্ষা ছিল চোখের পরিবর্তে চোখ এবং দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। তাদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন এত বেড়ে গিয়েছিল আর এ অভ্যাস এত গাঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, পিতা যদি প্রতিশোধ না নিত তাহলে ছেলে এবং তার নাতীর দায়িত্বের মধ্যে এ নির্দেশ থাকত সে যেন প্রতিশোধ নেয়। এ পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে বিদ্বেষের অভ্যাস বেড়ে গিয়েছিল, তারা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং নির্দয় হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টানগণ এ শিক্ষার বিপরীতে যে শিক্ষা দেয় তাহল কেউ যদি এক গালে থাপ্পর দেয় তবে অন্যটিও এগিয়ে দাও, বিনা পারিশ্রমিকে এক ক্রোশ নিয়ে গেলে দুই ক্রোশ চলে যাও ইত্যাদি। এ শিক্ষায় যে ত্রুটি রয়েছে তা পরিষ্কার, এতে আমল করা সম্ভব নয়। খৃষ্টান সরকারসমূহ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করছে যে, এ শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। কোন খৃষ্টানের এ সাহস হবে কি যে, কোন দুষ্ট থাপ্পর মেরে দাত ফেলে দিলে সে অন্য গাল এগিয়ে দিবে যে, আস এখন অন্য দাঁতটিও ফেলে দাও। এতে দুষ্ট তো আরো সাহসী হয়ে যাবে এবং সাধারণের শান্তিতে বাঁধা সৃষ্টি হবে। তথাপি আমরা কীভাবে স্বীকার করবো যে, এ শিক্ষা উত্তম অথবা খোদাতা'লার ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে। এটা যদি বাস্তবায়ন হয় তবে কোন দেশের ব্যাবস্থাপনা সম্ভব হবে না। এক দেশ কোন শত্রু ছিনিয়ে নিলে অন্যটি নিজে দিয়ে দিতে হবে। একজন অফিসার গ্রেফতার হলে আরও দশজনকে দিয়ে দিতে হবে। ঐ শিক্ষাসমূহে এ ত্রুটি রয়েছে এবং এগুলো সঠিক নয়। তবে এ হতে পারে যে, ঐ শিক্ষাসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিধান ছিল। সেই সময় যখন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন অন্য ব্যক্তিদের অবস্থানুযায়ী সেই শিক্ষা আর রইল না। ইহুদীদের যুগে তারা চারশত বৎসর পর্যন্ত দাসত্বের জীবন কাটিয়ে ছিল। দাসত্বের ঐ জীবনের কারণে তাদের হৃদয়ে কাঠিন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে গিয়েছিল। এটি নিয়মের কথা কেউ যে বাদশাহর যুগে বাস করে তার চরিত্রও সেই ধরনের হয়ে যায়। শিখদের যুগে অধিকাংশ মানুষ ডাকাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের যুগে শিক্ষা এবং সভ্যতা প্রসার লাভ করছে আর

প্রত্যেক ব্যক্তি এদিকে চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। সার সংক্ষেপ হচ্ছে, বনী ইস্রাঈল ফেরাউনের অধীনে ছিল আর এ কারণে তাদের মধ্যে নির্যাতনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই জন্য তওরাতের যুগে বিশেষ আদলের প্রয়োজন ছিল। কেননা তারা (আদল) থেকে অজ্ঞ ছিল এবং তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার অভ্যাস ছিল। তারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভাঙ্গা আবশ্যক এবং এটি আমাদের কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাদের শিক্ষা দিলেন যে, বিষয়টি কেবল আদলে সীমাবদ্ধ নয় বরং "এহসান"ও আবশ্যক। এ কারণে মসীহ্ (অ.) -এর মাধ্যমে তাদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অন্যটি এগিয়ে দাও। সমস্ত জোর যখন এহসানের উপর দেয়া হল তখন সবশেষে আঁ-হযরত (স.) -এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা এ শিক্ষাকে মূল সূক্ষ্মতায় পৌঁছে দিয়েছেন। সেই শিক্ষা মন্দের পরিবর্তে ততটুকু মন্দই। তথাপি যে ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌তা'লার নিকট রয়েছে। ক্ষমার শিক্ষা দিয়েছেন তবে সাথে সংশোধনের বাধ্য-বাধকতা রেখেছেন, ক্ষেত্র ছাড়া ক্ষমা ক্ষতি করে থাকে। সুতরাং এখানে চিন্তা করা উচিত, উদ্দেশ্য সংশোধনের হলে ক্ষমাই করা উচিত। যেমন দুইজন সেবকের মধ্যে একজন বড় ভালো বংশের, বাধ্য এবং হিতাকাঙ্ক্ষী কিন্তু ঘটনাক্রমে তার থেকে কোন ভুল হয়ে গেলে সেই সময় তাকে ক্ষমা করাই যথার্থ। তাকে শাস্তি দেয়া ঠিক হবে না। অন্য দিকে এক বদমায়েশ ও দুষ্ট প্রত্যেক দিন ক্ষতি করে আর দুষ্টামী থেকে বিরত হয় না, তাকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে আরও নির্ভীক হয়ে যাবে তাই তাকে শাস্তিই দেয়া উচিত। বস্তুত এভাবে ক্ষেত্র এবং পরিস্থিতি নির্ণয়ের মাধ্যমে কাজ করাই ইসলামের শিক্ষা যা পূর্ণাঙ্গ। আঁ-হযরত (স.) খাতামাননবীঈন এবং কুরআন শরীফ খাতামাল কুতুব এরপর নতুন কোন শিক্ষা বা শরীয়ত আসতে পারে না। এখানে অন্য কোন কলেমা বা নামায সম্ভব নয়। আঁ-হযরত (স.) যা কিছু বলেছেন, করে দেখিয়েছেন এবং কুরআন শরীফে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে ছেড়ে নাজাত (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়। যে এ গুলোকে পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটিই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস। সেই সঙ্গে এ-ও স্মরণ রাখা উচিত যে,এ উম্মতের জন্য কথোপকথন এবং বাক্যালাপের দরজা খোলা রয়েছে। বস্তুত এ দরজা কুরআন মজীদ এবং আঁ-হযরত (স.) -এর সত্যতার উপর সতেজ সাক্ষ্য। এজন্য খোদাতা'লা

সূরা ফাতিহায় এই দোয়া শিখিয়েছেন,

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

'ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম্ সিরাতাল্লাযীনা আনআ'মতা আলায়হিম' (সূরা ফাতিহা 1 ঃ 6-7)

(অর্থঃ তুমি আমাদেরকে সহজ সরল সুন্দর পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।- অনুবাদক) "আনআ'মতা আলায়হিমের" রাস্তার জন্য যে দোয়া শিখিয়েছেন তাতে নবীগণের কামালত" (চরম উৎকর্ষতা) লাভের দিকে ইশারা রয়েছে। প্রকাশ থাকে নবীগণকে যে "কামাল" দেয়া হয়েছে তা খোদার তত্ত্ব-জ্ঞানের কামালই ছিল। এ পুরস্কার তাদের কথোপকথন এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে লাভ হয়েছিল যার তোমরাও আকাঙ্খী। সুতরাং এ পুরস্কার সম্বন্ধে চিন্তা কর, কুরআন শরীফ এ দোয়ার নির্দেশ তো দিয়েছে কিন্তু এই নির্দেশের ফল কিছুই হল না অথবা এ উম্মতের কোন ব্যাক্তিও এ সৌভাগ্য লাভ করল না এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে বল এতে ইসলাম এবং আঁ-হযরত (স.)-এর কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হবে না অসম্মান? আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস রাখে সে ইসলামকে কলঙ্কিত করে এবং সে শরীয়তের মূলকে বুঝেই নি। ইসলামের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে এ বিষয়টি ছিল মানুষ যেন কেবল মৌখিক ভাবেই "ওয়াহদাহু লাশরীক" (এক-অদ্বিতীয়) না বলে বরং বাস্তবে উপলব্ধিও করে। বেহেশত ও দোযখের উপর ঈমান যেন কল্পনাপ্রসূত না হয় বরং বাস্তব জীবনে বেহেশতের অবস্থা সম্পর্কে যেন সংবাদ পায় এবং সেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায় যাতে হিংস্র মানুষ নিমজ্জিত। এই মহান উদ্দেশ্য মানুষের ছিল এবং আছে। এটি এমন পাক ও পবিত্র উদ্দেশ্য যে অন্য কোন জাতি নিজের ধর্মে এমন নমুনা ও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না। বলতে গেলে তো প্রত্যেকেই বলতে পারে কিন্তু কে আছে যে বাস্তবে দেখাতে পারে?

আমি আর্য্য ও খৃষ্টানদের জিজ্ঞাসা করেছি যে, সেই খোদা যাকে তোমরা বিশ্বাস কর তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন কর। তারা কেবল মৌখিক অহমিকা ও গর্ব ছাড়া কিছুই দেখাতে পারে না। সেই সত্য খোদা যাকে কুরআন শরীফ উপস্থাপন করেছে তা থেকে এ লোকেরা অজ্ঞ, এটি জানার

জন্যে কথোপকথনই একটি মাধ্যম যার কারণে ইসলাম অন্য সমস্ত ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু পরিতাপ! এই মুসলমানগণ আমার বিরোধিতার কারণে সেটিকেও অস্বীকার করেছে।

নিশ্চিত মনে রাখবে মানুষ পূর্ণাঙ্গীণভাবে আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনার পর পাপ থেকে পরিত্রাণের শক্তি লাভ করতে পারে। পাপের থাবা থেকে মুক্তি লাভ করাই মানুষের জীবনের বড় উদ্দেশ্য। দেখ! একটি সাপ দেখতে সুন্দর মনে হয়, বাচ্চা সেটিকে হাত দিয়ে ধরার আকাঙ্খা করতে পারে এবং হাত প্রসারিতও করতে পারে কিন্তু একজন বুদ্ধিমান জানে যে, সাপ ছোবল মারবে ও মেরে ফেলবে। সে কখনও সাপের দিকে অগ্রসর হবে না বরং সে যদি জানে কোন ঘরে সাপ আছে তাহলে সে সেখানে প্রবেশও করবে না। তেমনই বিষ, যেটিকে সে হত্যা করার জিনিস হিসাবে জানে সেটি খেতে বীরত্ব দেখাবে না। সুতরাং তেমনি পাপকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভয়ানক বিষ হিসেবে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস রূহানী তত্ত্ব-জ্ঞান ছাড়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর এটি কি বিষয় যে, মানুষ খোদাতা'লার উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও এবং পাপকে পাপ জেনেও পাপের উপর বীরত্ব দেখায়। এটির কারণ এছাড়া আর কি যে, সে রূহানী তত্ত্ব-জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি শূন্য যা পাপ সম্পাদনের স্বভাবের সৃষ্টি করে। এ বিষয় যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে মানতে হবে যে "মা'আ যাল্লাহি" (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) ইসলাম স্বীয় আসল উদ্দেশ্যে শূন্য। আমি বলছি এমন নয় বরং ইসলামই পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে। এটির মাধ্যম কেবল একটিই আর তা হচ্ছে, খোদার সঙ্গে কথোপকথন এবং বাক্যালাপ। কেননা এর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লার সত্তাতে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাস্তবে আল্লাহ্‌তা'লা পাপ থেকে অসন্তুষ্ট এবং তিনি পাপীকে শাস্তি দেন। পাপ এক বিষ বিশেষ যা প্রথমে ছোট থেকে আরম্ভ হয় অতঃপর বড় হতে থাকে আর পরিণামে "কুফরী"তে (অস্বীকারে) পৌঁছিয়ে দেয়।

আমি প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটি কথা বলছি যে, প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব জায়গায় নিজেদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চিন্তিত। উদাহরণস্বরূপ আর্য্য সাহেবগণ এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, পাপের শাস্তি ছাড়া পবিত্র হওয়ার কোন পদ্ধতি নেই। এক পাপের পরিবর্তে কয়েক লক্ষ জন্ম

চক্র রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই জন্ম-চক্রের কষ্ট সহ্য না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হতেই পারে না। কিন্তু এগুলোতে বড় কষ্ট রয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিই যখন পাপী তখন এ থেকে পরিত্রাণ কখন হবে? এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে তাদের নিকট এ বিষয় স্বীকৃত যে, পরিত্রাণ প্রাপ্তদেরও এক সময় 'মুক্তিখানা' (পরিত্রাণের জায়গা) থেকে বের করে দেয়া হবে। তাহলে এ পরিত্রাণ থেকে লাভ কি হ'ল? যখন এ প্রশ্ন করা হয় যে, নাজাতের পর কেন বের করে দিচ্ছ তখন কতক বলে বের করার জন্য একটি পাপ রেখে দেয়া হয়। চিন্তা করে বল এটি কি সর্বশক্তিমান খোদার কাজ হতে পারে? অতঃপর প্রত্যেক আত্মা যখন স্বীয় আত্মার স্রষ্টা, খোদাতা'লা তার স্রষ্টা নয় (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) তাহলে তার অধীনস্থ থাকার প্রয়োজনই বা কী?

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ খৃষ্টানদের তারা পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার একটি ব্যবস্থা এই চিন্তা করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা এবং খোদার পুত্র মেনে নাও। অতঃপর বিশ্বাস কর যে, তিনি আমাদের পাপের বোঝা উঠিয়েছেন এবং তিনি ক্রুশের মাধ্যমে অভিশপ্ত হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক (আমরা এ থেকে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাই- প্রকাশক)। এখন চিন্তা কর, মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে এ পদ্ধতির কি সম্পর্ক রয়েছে? পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আরও একটি বড় পাপ উদ্ভাবন করে মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে। এর চেয়ে বড় আর কোন পাপ হতে পারে কি? অতঃপর খোদা বানিয়ে তাৎক্ষণিক তাকে অভিশপ্ত আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে এর চেয়ে বড় বেয়াদবী এবং অসম্মানী আর কি হতে পারে? আহার নিদ্রার মুখাপেক্ষী একজন ব্যক্তিকে খোদা বানিয়ে নেয়া হয়েছে। অথচ তওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল আকাশ এবং জমিতে যেন অন্য খোদা না হয়। তারপর এ শিক্ষা দরজা এবং চৌকাঠসমূহে লিখে রাখা হয়েছিল। তাকে ছেড়ে এ নতুন খোদা বানানো হয়েছে যার (ত্রিত্ববাদের) কোন সংবাদ তওরাতে নেই।

আমি বিজ্ঞ ইহুদীদের জিজ্ঞেস করেছি তোমাদের কাছে এমন কোন খোদার সংবাদ আছে কি যে, মরিয়মের গর্ভ থেকে আসবে এবং ইহুদীদের হাতে মার খেতে থাকবে। এতে ইহুদী ওলামাগণ জবাব দেন এটি কেবল প্রতারণা, তওরাত থেকে এমন কোন খোদার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের খোদা তিনিই যিনি কোরান শরীফের খোদা। অর্থাৎ কুরআন মজীদ যেভাবে

খোদাতা'আলার একত্ববাদের সংবাদ দিয়েছে তদ্রুপ আমরা তওরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে খোদাতা'লাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করি। এছাড়া কোন মানুষকে খোদা হিসাবে গণ্য করতে পারি না। এটি তো মোটা কথা ইহুদীদের যদি কোন খোদার সংবাদ দেয়া হতো তাহলে তারা হযরত মসীহ্ (আ.)-এর এমন কঠিন বিরোধিতা কেন করতো। এমন কি তারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে এবং 'কুফর' বলার অভিযোগ উত্থাপন করে। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তারা এ বিশ্বাসকে মানতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। বস্তুত খৃষ্টানরা পাপ মোচনের জন্য যে চিকিৎসা প্রস্তাব করেছে তা এমন চিকিৎসা যা স্বয়ং পাপ সৃষ্টি করে। এতে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তারা পাপকেই পাপ মোচনের প্রতিকার প্রস্তাব করেছে যা কোন অবস্থা এবং পরিস্থিতিতেই সমীচীন নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের নির্বোধ বন্ধু। তাদের উপমা সেই বানরের ন্যায় যে নিজে বাঁচার জন্য স্বীয় মালিককে হত্যা করেছে। পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য এমন এক পাপ প্রস্তাব করেছে যা কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ "শির্‌ক" করেছে এবং দুর্বল মানুষকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের জন্য কত আনন্দের বিষয় যে, তাদের খোদা এমন খোদা নয় যার উপর কোন আপত্তি অথবা আক্রমণ হতে পারে। তারা তার শক্তি, কুদরত ও সিফাত (গুণাবলী) সমূহের উপর ঈমান রাখে। অথচ যারা মানুষকে খোদা বানিয়েছে এবং তার কুদরতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য খোদা বিদ্যমান থাকা না থাকা সমান। উদাহরণস্বরূপ আর্য্যদের বিশ্বাস হচ্ছে অণু পরমাণসমূহ নিজেই নিজ সত্তার খোদা আর তিনি (আল্লাহ্) কিছুই সৃষ্টি করেন নি। এখন বল অণু পরমাণুর স্রষ্টা যদি খোদা নন তবে অণু পরমাণুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খোদার প্রয়োজন কী? শক্তি যখন নিজে নিজেই বিদ্যমান এবং সেগুলির সংযোজন ও বিয়োজনের শক্তিও নিজেই রাখে তবে ইনসাফের সাথে বল, তাদের জন্য খোদার সত্তার প্রয়োজন কি? আমি মনে করি এ আকীদা পোষণকারী আর্য্য এবং নাস্তিকদের মধ্যে মাত্র উনিশ বিশের পার্থক্য। কেবল ইসলামই এমন এক ধর্ম যা পূর্ণ এবং জীবিত। এখন পুনরায় ইসলামের শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এ উদ্দেশ্যকে নিয়েই আমি আগমন করেছি।

বর্তমানে আকাশ থেকে যে নূর এবং বরকত নাযেল হচ্ছে মুসলমানদের সেগুলোর সম্মান করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করা উচিত যে, তিনি সঠিক সময়ে তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় ওয়াদানুযায়ী এ বিপদের সময় সাহায্য করেছেন। তথাপি তারা যদি খোদাতা'লার এ নেয়ামতের সম্মান না করে তবে খোদাতা'লা তাদের কোন পরওয়া করবেন না। তিনি স্বীয় কাজ অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন কিন্তু তাদের জন্য হবে পরিতাপ।

আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টিতে বলছি যে, আল্লাহ্‌তা'লা অন্য ধর্মগুলোকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত এবং শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেছেন। এখন কোন হাত এবং শক্তি এমন নেই যে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার মোকাবেলা করতে পারে। তিনি

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ط

'ফা'আলুল্লিমা ইউরীদ' (সূরা বুরুজ 85 ঃ 17)

(অর্থঃ আল্লাহ্ যা চান তা করেন। - অনুবাদক) হে মুসলমানগণ! স্মরণ রাখবে আল্লাহ্‌তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন আর আমি আমার সেই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। এখন এটিকে শ্রবণ করা বা না করা তোমাদের দায়িত্ব। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এটি সত্য কথা। আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি, যে প্রতিশ্রুত আসার ছিল আমিই সেই। এটিও নিশ্চিত বিষয় যে, **ঈসার মৃত্যুতে ইসলামের জীবন নিহিত।**

এ বিষয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, এই বিষয়টিই খৃষ্টান ধর্মকে নিঃশেষকারী। এটি খৃষ্টান ধর্মের অত্যন্ত মজবুত খুঁটি আর এর উপরই এই ধর্মের অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। একে নিঃশেষ হতে দাও। আমার বিরুদ্ধবাদীরা যদি খোদাভীতি এবং তাকওয়ার সাথে কাজ করত তাহলে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। এমন এক জনের নাম বল, যে হিংস্রতা পরিত্যাগ করে আমার নিকট এসেছে এবং নিজের সান্ত্বনা চেয়েছে। তাদের অবস্থাতো এই যে, আমার নাম উচ্চারণ করতেই তাদের মুখ থেকে ফেনা আসা আরম্ভ হয়ে যায় এবং তারা গাল মন্দ দিতে আরম্ভ করে। এভাবেও কি কোন ব্যক্তি সত্যকে পেতে পারে।

আমি কুরআন শরীফের অকাট্য যুক্তি, হাদীস এবং সাহাবাদের (রা.) ইজমা পেশ করছি অথচ তারা এ কথাগুলোকে শ্রবণ না করে "কাফের" "কাফের" এবং "দাজ্জাল" "দাজ্জাল" বলে চিৎকার করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি তোমরা কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ কর, মসীহ্ জীবিত আকাশে চলে গিয়েছেন। আঁ-হযরত (স.)-এর বর্ণনার বিরোধী কোন বিষয় উপস্থাপন কর। অথবা আবু বকর (রা.)-এর সময় আঁ-হযরত (স.)-এর মৃত্যুতে প্রথম যে ইজমা হয়েছিল সেটির বিপরীত কোন প্রমাণ উপস্থাপন কর, তখন (তাদের) কোন জবাব পাওয়া যায় না। এছাড়া কতক মানুষ চিৎকার করে আগমনকারী মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যদি ইস্রাঈলী নবী না হন তবে আগমনকারীর এ নাম কেন রাখা হয়েছে? আমি বলছি যে, এ আপত্তি অত্যন্ত নির্বোধ সুলভ। আশ্চর্যের বিষয় আপত্তিকারীরা নিজের সন্তানদের নাম মূসা, ঈসা, দাউদ, আহমদ, ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল রাখতে পারে আর আল্লাহ্ যদি কারো নাম ঈসা রাখেন তাহলে তাতে আপত্তি। এ জায়গায় চিন্তার বিষয় তো এটি ছিল যে, আগমনকারী নিদর্শন সহ এসেছে কি না? তারা যদি এ নিদর্শনসমূহকে দেখতো তবে অস্বীকারের সাহস করত না কিন্তু তারা নিদর্শন এবং সাহায্যসমূহের তোয়াক্কা না করে দাবী শুনতেই বলে দিল 'আন্তা কাফের" (অর্থাৎ তুমি কাফের - অনুবাদক)।

এটি নিয়মের বিষয় যে, খোদাতা'লার নবী এবং প্রত্যাদিষ্টদের চেনার মাধ্যম হচ্ছে তাদের মো'জেযা এবং নিদর্শন। যেমন সরকারের পক্ষ থেকে যদি কাউকে বিচারক বানানো হয় তবে তাকে নিদর্শন দেয়া হয়ে থাকে। তদ্রুপ খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্টদের চেনার জন্যও নিদর্শন হয়ে থাকে। আমি দাবীর সঙ্গে বলছি খোদাতা'লা আমার সাহায্যার্থে একটি দুটি, একশ দু'শ নয় বরং লক্ষ লক্ষ নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। ঐ নিদর্শনসমূহ এমন নয় যে, কেউ সেগুলোকে জানে না বরং লক্ষ সংখ্যায় সেগুলোর সাক্ষী রয়েছে। আমি বলতে পারি এ জলসাতেও এমন শত শত সাক্ষী উপস্থিত আছেন। আমার জন্য আসমান থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং জমিন থেকেও নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত নিদর্শন যা আমার দাবীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং পূর্ববর্তী নবীগণ ও আঁ হযরত (স.)-এর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেগুলো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেই সমস্ত (নিদর্শনসমূহ) থেকে একটি নিদর্শন হচ্ছে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যা আপনারা সকলেই অবলোকন

করেছেন। সহীহ হাদীসে সংবাদ দেয়া হয়েছিল মসীহ্ এবং মাহদীর সময় রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। বলুন, এ নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে কি না? কেউ আছে কি যে বলবে আল্লাহ্ এ নিদর্শন দেখান নি? তেমনি এ সংবাদ ও দেয়া হয়েছিল যে, সেই যুগে প্লেগ ছড়াবে,এত ভয়ানক হবে যে ১০ জনের মধ্যে থেকে ৭ জন মারা যাবে এখন বল প্লেগের নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে কি না? আরও লেখা ছিল যে, সে সময় এক প্রকার নতুন বাহন আবিষ্কার হবে যার কারণে উট বেকার হবে। রেল প্রবর্তনের মাধ্যমে এ নিদর্শন পূর্ণ হয়নি কি? নিদর্শনের ধারাবাহিকতা এত ব্যাপক যে আমি কতদূর পর্যন্ত গণনা করব। এখন চিন্তা কর, আমি দাবীকারক দাজ্জাল এবং কাফের আখ্যায়িত হয়েছি। তাহলে এটি কি যুলুম হলো যে, আমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর জন্য এই সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর আগমনকারী যদি অন্য কেউ হয়ে থাকে তাহলে সে কি পাবে? সামান্যতম ইনসাফ কর এবং খোদাকে ভয় কর। খোদাতা'লা কি কোন মিথ্যাবাদীকে এমন সাহায্য করে থাকেন। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, আমার মোকাবেলায় যে এসেছে সে বিফল এবং ব্যর্থ হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা আমাকে যে সমস্ত কষ্ট ও বিপদে ফেলেছে আমি তা থেকে নিরাপদ এবং সফল হয়ে বেরিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও আমি মিথ্যাবাদী হলে কেউ কসম খেয়ে বল যে, মিথ্যাবাদীর সঙ্গেও এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমাকে পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় যে, এ ভিন্নমত পোষণকারী আলেমগণের কি হয়েছে, তারা কেন ভাল করে কুরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহ পড়ে না? তারা কি জানে না যে, উম্মাতের যত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ গত হয়েছেন, তারা সকলেই মসীহ্ মওউদ এর আগমন চৌদ্দ শতাব্দীতে (হবে বলে) উল্লেখ করেছেন। সকল দিব্যদর্শন লাভকারীদের দিব্যদর্শন এখানে পৌঁছে থেমে গেছে। 'হুজাজুল কেরামায়' পরিষ্কার রয়েছে যে (ইমাম মাহদীর আগমন) চৌদ্দ শতাব্দী অতিক্রম করবে না। এ সকল ব্যক্তি মিম্বরে চড়ে বর্ণনা করত যে, তের শতাব্দী থেকে প্রাণীরাও ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে। চৌদ্দ শতাব্দী, বরকত পূর্ণ হবে কিন্তু এটি কি হলো সেই চৌদ্দ শতাব্দী যাতে একজন প্রতিশ্রুত ইমাম আসার ছিলেন সেখানে সত্যবাদী আসার পরিবর্তে মিথ্যাবাদী এসে গেল আর তার সমর্থনে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নিদর্শনও প্রকাশ পেল এবং খোদাতা'লা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং মোকাবেলায় তার সাহায্যও করেছেন। একথাগুলো চিন্তা করে জবাব দাও। এমনিতে মুখ থেকে একটি কথা বের

করা সহজ কিন্তু খোদাতা'লার ভয় রেখে কথা বলা কঠিন।

এ ছাড়া এ কথাও দৃষ্টি দেয়ার যোগ্য খোদাতা'লা একজন মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক মানুষকে এত ব্যাপক অবকাশ দেন না যাতে সে আঁ-হযরত (স.) থেকেও বেশী বয়স পাবে। আমার বয়স ৬৭ বৎসর এবং আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার বয়স ২৩ বছরেরও অধিক হয়ে গিয়েছে। আমি যদি এমনই মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক হতাম তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা এ বিষয়টিকে এতো দীর্ঘায়িত হতে দিতেন না। কতক ব্যক্তি এটিও বলে যে, তোমার আসাতে কী উপকার হয়েছে? স্মরণ রাখবে আমার আসার উদ্দেশ্য দু'টি। প্রথমত, এ সময় অন্যান্য ধর্মের ইসলামের উপর যে প্রাধান্য রয়েছে আর মনে হচ্ছে যেন তারা ইসলামকে গিলে ফেলছে, ইসলাম অত্যন্ত দূর্বল এবং এতীম বাচ্চার ন্যায় হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন খোদাতা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন অকার্যকর ধর্মসমূহের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করি। ইসলামের শক্তিশালী দলিল এবং সত্যতার প্রমাণ সমূহ উপস্থাপন করি। সেই প্রমাণসমূহে জ্ঞানমূলক দলিল ছাড়াও আসমানী নূর এবং ঐশী বরকত রয়েছে যা সর্বদা ইসলামের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এখন যদি তোমরা পাদ্রীদের রিপোর্টগুলো পড় তাহলে বুঝতে পারবে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং তাদের এক একটি পুস্তিকা কত ব্যাপক সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় ইসলামের নাম উজ্জ্বল করা আব্যশক ছিল। অতএব এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি নিশ্চিত বলছি, ইসলামের বিজয় অবশ্যই হবে এবং সেগুলোর চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ এটি সত্য কথা যে এ বিজয়ের জন্য কোন তরবারি বা বন্দুকের প্রয়োজন নেই। খোদাতা'লাও আমাকে হাতিয়ার দিয়ে পাঠান নি। এ সময় যে ব্যক্তি এমন ধারণা করবে সে ইসলামের বোকা বন্ধু। ধর্মের উদ্দেশ্য হৃদয়গুলোকে জয় করা হয়ে থাকে, এ উদ্দেশ্য তরবারি দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। আমি অনেক বার বলে এসেছি আঁ হযরত (স.)-এর তরবারি ধারণ করা কেবল স্বীয় হেফাযত এবং আত্মরক্ষার জন্য ছিল। সেটি ঐ সময় ছিল যখন বিরুদ্ধবাদী এবং অস্বীকারকারীদের নির্যাতন সীমা অতিক্রম করেছিল এবং অসহায় মুসলমানদের রক্তে জমিন লাল হয়ে গিয়েছিল।

বস্তুত আমার আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামকে

বিজয়ী করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ সকল লোক যারা বলে আমরা নামায পড়ি, এই করি, ঐ করি এগুলো কেবল মৌখিক হিসাব। এর জন্য আবশ্যক মানুষের মধ্যে যেন সেই পরিবর্তন সাধন হয় যা ইসলামের মূল ভিত্তি। আমি কেবল এটি জানি, কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী (রা.)-এর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট না হয়। তাদের পৃথিবীর সঙ্গে ভালবাসা ছিল না বরং তারা নিজের জীবন খোদাতা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। এখন যা কিছু রয়েছে তা সবই পার্থিব, পৃথিবীতে এতো মোহ সৃষ্টি হচ্ছে যে, খোদাতা'লার জন্য কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকতে দিচ্ছে না। ব্যবসায়, বাণিজ্য, অট্টালিকা এমন কি নামায রোযাও যদি করে তাও দুনিয়ার জন্য। পার্থিবতায় লালায়িতদের সান্নিধ্য লাভের জন্য সবকিছু করা হয় কিন্তু ধর্মের বিন্দু পরিমাণ পাওয়া নেই। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে ইসলামকে মানা এবং গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি এতটুকুই ছিল যা মনে করে নেয়া হয়েছে? অথবা ভিন্ন কোন উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। আমি কেবল এটি জানি মু'মিনকে পবিত্র করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে ফেরেশতাদের গুণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততই খোদাতা'লার কালাম শুনে এবং তা থেকে সান্ত্বনা পায়। তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ হৃদয়ে চিন্তা করা উচিত যে, সেই মর্যাদা লাভ হয়েছে কি? আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা কেবল খোসা এবং ছিলকার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছ। অথচ এটি কোন বিষয় নয়, খোদাতা'লা মূলকে চান। অতএব ইসলামের উপর বাহিরের আক্রমণসমূহ যেভাবে প্রতিরোধ করা আমার কাজ তদ্রুপ ইসলামের বাস্তবতা এবং রূহ সৃষ্টি করাও আমার কাজ। আমি চাচ্ছি মুসলমানদের হৃদয়ে খোদাতা'লার পরিবর্তে পৃথিবীর মূর্তিকে যে সম্মান দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর আশা-আকাঙ্খা, মোকদ্দমা এবং মীমাংসার যে মূর্তি রয়েছে, সেই মূর্তিকে যেন চুর্ণ-বিচুর্ণ করা যায়। তাদের হৃদয়ে যেন আল্লাহ্‌তা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সৃষ্টি হয়, এছাড়া ঈমানের বৃক্ষ যেন সতেজ ফল দেয়। এখন বৃক্ষের আকৃতি তো রয়েছে কিন্তু আসল বৃক্ষ নেই। কেননা আসল বৃক্ষ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ-

اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۙ تُؤْتِىۡۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍۢ بِاِذۡنِ رَبِّهَا ؕ

'আলাম্ তারা কায়ফা যারাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইয়্যিবাতান কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন আস্লুহা সাবিতুঁওয়া ফার'ওহা ফিচ্ছামায়ি তু'তি উকুলাহা কুল্লাহিনিম্ বিইয্নি রাব্বিহা' (সূরা ইব্রাহীম 14 ঃ 25-26)

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্তা'লা কীভাবে উপমা বর্ণনা করেন অর্থাৎ পূর্ণ ধর্মের উপমা সেই পবিত্র কলেমার ন্যায় যার মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং শাখাসমূহ আকাশে বিস্তৃত। সেটি সর্বদা স্বীয় প্রভুর নির্দেশে ফল দেয়। "আস্লুহা সাবেতুন" এর অর্থ হচ্ছে, ঈমানের মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণ বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে গিয়েছে এবং তা সর্বদা স্বীয় ফল দিচ্ছে। কোন সময় শুকনো বৃক্ষের ন্যায় হয় না। বল, এখন কি সেই অবস্থা আছে। অনেকে বলে থাকে প্রয়োজনই বা কি? সেই রোগী কতই নির্বোধ যে বলে ডাক্তারের প্রয়োজনই বা কি? সে যদি ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন অনুভব না করে তাহলে এর ফল মৃত্যু ব্যতীত আর কি হতে পারে? এখন নিঃসন্দেহে মুসলমানগণ "আস্লামনা" তে তো রয়েছে কিন্তু "আমান্না"-এর গন্ডিভূক্ত নেই। "আমান্না" সেই সময় লাভ হয় যখন একটি নূর সাথী হয়।

বস্তুত এগুলো সেই কথা যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। এজন্য আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য তাড়াহুড়া করো না বরং খোদাতা'লাকে ভয় এবং তওবা কর। কেননা তওবাকারীদের জ্ঞান তীক্ষ্ন হয়ে থাকে। প্লেগের নিদর্শন অত্যন্ত ভয়ানক নিদর্শন এ সম্পর্কে খোদাতা'লার যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তা হচ্ছে ঃ-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ

'ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়্যিরু মাবিকওমিন্ হাত্তা ইউগাইয়্যিরু মা বি আনফুসিহিম' (সূরা রা'দ 13 ঃ 12)

(অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। - অনুবাদক)

এটি খোদাতা'লার কালাম। সেই ব্যক্তির জন্য অভিসম্পাত যে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে প্রতারণা করে। খোদাতা'লা বলেছেন, আমার পরিকল্পনা সেই সময় পরিবর্তন হবে যখন হৃদয়সমূহ পরিবর্তন হবে। সুতরাং খোদাতা'লা এবং তাঁর ক্রোধকে ভয় কর। সাধারণ বিষয়ে কেউ কারো দায়িত্ব নিতে পারে না, কারো কোন সাধারণ মোকদ্দমা হলে অধিকাংশ লোক বিশ্বস্ততা ছেড়ে দেয়। তাহলে আখেরাত সম্পর্কে কি ভরসা করতে পার? আল্লাহ্‌ বলেন ঃ-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

'ইয়াউমা ইয়া ফির্‌রুল মার্‌উ মিন্‌ আখীহি' (সূরা আ'বাসা 80ঃ 35)

(অর্থঃ সেদিন মানুষ নিজ ভাই থেকেও পলায়ন করবে।) বিরুদ্ধ বাদীদের কর্তব্য ছিল সুষ্ঠু ধারণা রাখা এবং

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

'লা তাক্‌ফু মা লাইসা লাকা বিহী ই'ল্‌ম' (সূরা বনী ইসরাঈল 17 ঃ 37)

(অর্থঃ এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সেটির পশ্চাদানুসরণ করো না। - অনুবাদক) এর উপর আমল করা। কিন্তু তারা তাড়াহুড়া করল। স্মরণ রাখবে পূর্বের জাতিসমূহ এভাবেই ধ্বংস হয়েছে। জ্ঞানী সেই যে বিরোধিতা করার পরও যখন সে বুঝে যে, সে ভ্রান্তিতে আছে তখন তা ছেড়ে দেয়। খোদাতা'লার ভয় থাকলে এ বিষয় লাভ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করাই পুরুষত্বের কাজ। সেই বীর এবং খোদাতা'লা তাকে পছন্দ করেন।

এ সমস্ত কথা ছাড়া এখানে আমি কিয়াস সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাদের ইজমার অকাট্য প্রমাণসমূহ আমাকে সাহায্য করছে। ঐশী নির্দেশ এবং সাহায্যসমূহ আমার সমর্থন করছে। **সময়ের প্রয়োজনীয়তাও আমার সত্যবাদী হওয়া প্রমাণ করছে**। তা সত্ত্বেও কিয়াসের মাধ্যমে এ দলিল পূর্ণ করা যেতে পারে। এজন্য দেখা উচিত কিয়াস কী বলে? দৃষ্টান্ত ছাড়া মানুষ কখনো এমন কোন বিষয়কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি বলে বাতাস তোমার সন্তানকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে অথবা সন্তান কুকুর হয়ে পালিয়ে গেছে। তোমরা

কি এ কথাকে বিনা যুক্তিসঙ্গত কারণ এবং যাচাই বাছাই ছাড়া মেনে নিবে? কখনো নয়। এ কারণে কুরআন মজীদ বলে ঃ-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

‘ফাসআলু আহলায্যিক্রি ইন কুনতুম লা’তালা মুন’ (সূরা আন্ নাহ্ল 16 ঃ 44)

(অর্থঃ অতএব,তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে যিক্রান (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর। -অনুবাদক) এখন তাহলে মসীহ্ (আ.) -এর মৃত্যু সংক্রান্ত দলীলগুলো ছাড়া তাঁর মৃত্যু এবং আকাশে চলে যাওয়া সম্পর্কে চিন্তা করো। এটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে ‘কুফ্ফার’ (অবিশ্বাসকারীগণ) আঁ হযরত (সা.) থেকে আকাশে চড়ে যাওয়ার মো’জেযা চেয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) যিনি সমস্ত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গীণ এবং উত্তম ছিলেন তার উচিত ছিল আকাশে চড়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি খোদা তা’লার ওহীর ভিত্তিতে জবাব দিলেন ঃ-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

‘কুল্ সুব্হানা রাব্বী হাল্ কুন্তু ইল্লা বাশারার্ রাসূলা’ ‘(সূরা বনী ইসরাঈল 17 ঃ 94)

(অর্থঃ তুমি বল,আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানব রসূল। -অনুবাদক) এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, (হে মুহাম্মদ) তুমি বলে দাও আল্লাহ্ তা’লা ওয়াদাবহির্ভূত কাজ করা থেকে পবিত্র। তিনি যখন মানুষের জন্য সশরীরে আকাশে যাওয়া নিষিদ্ধ করে রেখেছেন তখন আমি যদি যাই তবে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব। অতএব তোমাদের এই বিশ্বাস যদি সঠিক হয় যে,মসীহ্ আকাশে চলে গেছেন তাহলে এর মোকাবেলায় কোন পাদ্রী যদি এ আয়াত উপস্থাপনপূর্বক আঁ- হযরত (সা.) -এর উপর আপত্তি করে তাহলে তোমরা এর কি জবাব দেবে? সুতরাং এমন বিষয়সমূহ মান্য করার কি প্রয়োজন যার ভিত্তি কোরআন মজীদে বিদ্যমান নেই? এভাবে তোমরা ইসলাম এবং আঁ-হযরত (সা.) কে কলঙ্ককারী সাব্যস্ত করবে। অতঃপর পূর্বের কিতাবসমূহেও কোন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নেই। সেই সমস্ত কিতাবসমূহ থেকে দলীল নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্তা’লা বলেন ঃ-

شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ اِسۡرَآءِيۡلَ

‘শাহিদা শাহিদুম্ মিম্ বানী ইসরাঈলা’ (সূরা আহ্‌কাফ 46 ঃ 11)

(অর্থঃ বনী ইসরাঈল থেকে একজন সাক্ষী তার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দিয়েছে। -অনুবাদক) অতঃপর বলেছেন ঃ-

كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًۢا بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَكُمۡ ۙ وَمَنۡ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡكِتٰبِ

‘কাফা বিল্লাহি শাহীদান্ বাইনি ওয়া বায়নাকুম্ ওয়া মান্ ই’নদাহু ই’লমুল কিতাব’ (সূরা রা’দ 13 ঃ 44)

(অর্থঃ আল্লাহ্ই আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যার কাছে এ কিতাবের জ্ঞান আছে। -অনুবাদক) এমনিভাবে আল্লাহ্‌তা’লা অন্যত্র বলেন ঃ-

يَعۡرِفُوۡنَهٗ كَمَا يَعۡرِفُوۡنَ اَبۡنَآءَهُمۡ

“ইয়া’রিফুনাহু কামা ইয়া’রিফুনা আবনায়াহুম” (সূরা বাকারা 2 ঃ 147)

(অর্থঃ তারা এটিকে সেইভাবেই চেনে যেভাবে তারা নিজেদের পুত্রদের চিনে থাকে। - অনুবাদক) (আল্লাহ্‌তা’লা) যখন এগুলোকে আঁ-হযরত (স.)-এর নবুওয়ত প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করেছেন তখন আমাদের এগুলো থেকে দলীল নেয়া কেন হারাম হয়ে গেল?

সেই সমস্ত কিতাবগুলোর মধ্য থেকে মালাকী নবীর একটি অধ্যায় বাইবেলে রয়েছে। সেটিতে মসীহ্ -এর পূর্বে ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যখন আগমন করেন তখন মালাকী নবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ থেকে ইলিয়াসের পুনরায় আগমনের প্রশ্ন রাখা হয়। হযরত মসীহ্ সিদ্ধান্ত দিলেন, সেই আগমনকারী ইয়াহইয়ারূপে এসে গিয়েছে।

দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ কী তা হযরত ঈসা (আ.)-এর আদালত থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। সেখানে ইয়াহইয়ার নাম ইলিয়াস সদৃশ্য রাখা হয় নি বরং তাকেই ইলিয়াস আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখন এ কিয়াসও আমার সত্যায়ন করছে। আমি তো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি কিন্তু আমার

অস্বীকারকারীরা কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে না। এ পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে কতক ব্যক্তি বলে যে, এ সকল কিতাব পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। পরিতাপ! এ ব্যক্তিরা এতটুকু জানেন না যে, আঁ-হযরত (স.) এবং সাহাবারা সেগুলো থেকে সনদ গ্রহণ করতেন। (উম্মতের) অধিকাংশ সম্মানিত ব্যক্তি এ কিতাবগুলোর পরিবর্তন অর্থবোধক হিসাবে নিয়েছেন। বোখারীও এটিই বলেছেন। এছাড়া ইহুদী এবং খৃষ্টানদের একে অন্যের সঙ্গে প্রাণের শত্রুতা রয়েছে, কিতাবও পৃথক পৃথক। তারা (ইহুদীরা) এখনও বিশ্বাস করে ইলিয়াস দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। এ বাধা না হলে তারা হযরত মসীহ্‌কে মেনে নিত না। আমার নিকট একজন বিজ্ঞ ইহুদীর কিতাব আছে যাতে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে আপীল করেছেন, আমাকে যদি এ প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি মালাকী নবীর অধ্যায় খুলে সম্মুখে রেখে দিব। ঐ অধ্যায়ে ইলিয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

চিন্তা করে দেখ লক্ষ লক্ষ ইহুদী তাদের খেদমতসমূহ সত্ত্বেও জাহান্নামী, শূয়র এবং বানর হলো! তাহলে আমার মোকাবেলায় এ আপত্তি সঠিক হবে কি? মসীহ্ ইবনে মরিয়মের বর্ণনায় ইহুদীগণ নিষ্কৃতি পেতে পারে, কেননা তাদের মধ্যে কোন পূর্ব উপমা ছিল না কিন্তু এখন কোন আপত্তি অবিশিষ্ট নেই। মসীহ্‌র মৃত্যু কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত। আঁ-হযরত (স.)-এর বর্ণনা এটির সত্যায়ন করছে। অতঃপর আগমনকারী সম্পর্কে কুরআন শরীফ এবং হাদীসে 'মীনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) এসেছে। এছাড়া খোদাতা'লা আমাকে শূন্য হাতে পাঠান নি আমার সত্যায়নের জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নির্দশন প্রকাশিত হয়েছে। এখনও যদি কেউ আমার নিকট ৪০ দিন অবস্থান করে তবে সে নিদর্শন দেখতে পাবে। লেখরামের নিদর্শনটি মহান নিদর্শন, নির্বোধরা বলে থাকে আমি হত্যা করিয়েছি। এ আপত্তি যদি সঠিক হয় তাহলে এমন নিদর্শন সমূহের ভরসা উঠে যাবে। কাল কেউ বলে বসবে, হয়তো খসরু পারভেজকে মা'আযাল্লাহু (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন- অনুবাদক) আঁ-হযরত (স.) হত্যা করিয়েছেন। এমন আপত্তি করা সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাজ নয়।

সর্বশেষে পুনরায় আমি বলছি যে, আমার নিদর্শনসমূহ অল্প নয়, এক লক্ষেরও অধিক। মানুষ আমার নিদর্শনের সাক্ষী আর তারা জীবিত

আছেন। আমাকে অস্বীকার করতে তাড়াহুড়া করো না, নতুবা মৃত্যুর পর কী জবাব দিবে? **নিশ্চিত স্মরণ রাখবে খোদাতা'লা মাথার উপর আছেন। তিনি সত্যবাদীকে সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন।**

(বদর ঃ ২০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ ইং পৃষ্ঠা ৪ থেকে ১৮)